শেষ শ্রাদ্ধ

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ

রঞ্জন প্রকাশালয়
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৪২
1935

মূল্য পাঁচসিকা

২৫।২ মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তার নেবার জন্য তার বাপ ঠিক করাই এক দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে উঠবে, এই-রকম theory যাঁর মাথায় স্থান পেয়েছে সেরূপ প্রেমরোগগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য রাঁচির পাগলাগারদই ঠিক, সাহিত্যক্ষেত্র নয়।সমাজবিধি-প্রণেতারা কখনও একথা মনে করেন নি যে মানুষ শুধু প্রেমই করবে, আর কিছুই ক'রবে না। তার মনুষ্যত্ববিকাশের জন্য যেন শুধু প্রেমের চর্চ্চাই প্রয়োজন। উচ্চতর কর্ম্মক্ষেত্রের চিন্তায় তাঁরা চিন্তিত ছিলেন, তাই জীবধর্ম্মের প্রতি প্রয়োজন অনুযায়ী লক্ষ্য রেখে তাঁরা সমাজবিধি প্রণয়ন করেছেন।—একথা সব সমাজের পক্ষেই খাটে। এত কথা অবশ্য বলবার প্রয়োজন হ'ত না যদি লেখক তাঁর শিল্পের সীমা অতিক্রম ক'রে অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে পাঠকের সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে অন্যায়রূপে আঘাত না ক'রতেন। যদি তিনি নিজের মতটি ব্যক্ত করতে যেয়ে এমন ক'রে নিজেকে না ধরা দিতেন—চরিত্রহীন প্রভৃতি অন্যান্য বই-এ তিনি এতটা ধরা দেন নি—অথবা যদি নিজের মতটিই তিনি সুচারু শিল্পের মাধুর্য্যে মহিমান্বিত ক'রতে পারতেন—তবে লেখকের নিতান্ত absurd-theoryটাও তত দোষের হ'ত না, সৌন্দর্য্যের শক্তি সকল গ্লানি হরণ করত। কিন্তু নিরতিশয় উপদেশাত্মক তাঁর সৃষ্টি, শিল্পটা একেবারে অনাদৃত,—তাই তাঁর উপদেশের মর্ম্মটির সম্বন্ধে কিছু বলতেই হ'ল।

এবার style সম্বন্ধে দু' এক কথা বলেই শেষ ক'রব। যেগুলি তাঁর ভাষার বিশেষত্ব সেইগুলিই এ বইখানিতে রীতিমত মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে। "বোধ করি", "বস্তুতঃ", "এম্‌নিই হয়", "কতটুকুইবা", "মানে ?", "মানে নেই এম্‌নি"—এই সব কথাগুলি স্থানে অস্থানে লাগিয়ে দেওয়ায় অত্যন্ত শ্রুতিকটু হ'য়েছে। তারপর কমল কথা ব'লতে ব'লতে "কিন্তু এইবার আমি উঠি, রাত্রি হ'ল, আর না" এবং "সে সত্যই চলিয়া যায় দেখিয়া" অপরপক্ষ ব্যাকুলভাবে আর একটি

প্রশ্নের উত্তর আকাঙ্ক্ষা ক'রলেন—এরূপ situation গুলো এত কষ্টদায়ক যে প্রায় অসহ্য। তারপর কমলের কথা কেহই বুঝতে পারছে না, অপরের পক্ষে বড়ই দুর্ব্বোধ্য, হেঁয়ালির মত লাগছে, অধিকাংশ চরিত্রই এমন কথা বলছে। অথচ সাধারণ কথাগুলো কেন যে দুর্ব্বোধ্য তারও কারণ দেখি না, অপরের অতিমাত্রায় বিস্ময় প্রকাশও যে কেন তাও বুঝতে পারি না। কমল কারণে অকারণে যখন তখন যেন কি একটা গূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ কথা ভাবের প্রেরণায় বলছে, অপরে শুনে মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম ক'রছে, এইসব প'ড়ে প'ড়ে ত জ্বালাতনের একশেষ হ'তে হয়। মোটের উপর কষ্টকল্পিত আধারহীন উদ্দেশ্যহীন ভাব-প্রবণতার যা দুর্দ্দশা হয়, it degenerates into bathos—বইটির ভাষা ও কল্পনা তারই একটি চরম দৃষ্টান্ত। এইরূপ আরও বিস্তর ব্যাধি আছে—যা parodyর মধ্যেই প্রকাশ পাবে। বইটি সর্ব্ব উপাদানে জড়িয়ে এমন একটি বিচিত্র বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে এইটিই স্বয়ং যেন একটি প্রহসন। তাই একবার মনে হয়েছিল প্রহসনের আবার parody কেন? কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে শেষ পর্য্যন্ত লিখতেই হল।

"শেষ প্রশ্ন" ও "শেষ শ্রাদ্ধ"

শরৎচন্দ্রের "শেষ প্রশ্ন" প'ড়ে প্রথম প্রশ্নটি মনে জেগেছিল যে এই শেষের প্রশ্নটি কি? তার একমাত্র উত্তর বোধ হয় এই হ'তে পারে যে সেইটিই শেষ প্রশ্ন।

সম্ভবতঃ এটি হচ্ছে একটি প্রব্লেম-নভেল; অন্ততঃ লেখকের উদ্দেশ্য যে এটাকে সেই রকম একটা কিছু ক'রে তোলেন। প্রব্লেমটার বিষয় পরে দু'এক কথা ব'লব। কিন্তু নভেল হিসাবে মনে হয় বইটি লেখকের বৃদ্ধ বয়সের একটি চূড়ান্ত বিফলতা। অন্ততঃ যিনি "পল্লীসমাজ" "দত্তা" ইত্যাদি লিখেছেন, তাঁর আর্টের হাতটি এ বইখানিতে একেবারে আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে। একটি চরিত্রকেও তিনি প্রাণবান কর্‌তে পারেন নি, শুধু তাই নয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের নিতান্ত হাস্যজনক ক'রে তুলেছেন। কি ক'রে যে তিনি নিজে এটা অনুভব করেন নি, অন্ততঃ তাঁর মত একজন সুবিখ্যাত শিল্পী—সেটা গবেষণার বিষয়।

এক কথায় বল্‌তে গেলে শরৎচন্দ্র তাঁর এ বইখানিতে সহজ সুষ্ঠুতার ধারণাটিকে বার বার লাঞ্ছিত ক'রেছেন। তা হ'লেও তত ক্ষতি ছিল না, সুষ্ঠুতার মাত্রা অতিক্রম ক'রেও সম্ভবতঃ বড় কাব্য রচিত হ'তে পারে, যদি আর্টিষ্ট তাঁর আর্টের শক্তি দিয়ে সেই অভাবটি ঢেকে দিতে পারেন। বইটির সর্ব্বপ্রধান দোষ হচ্ছে এই যে, লেখক তা' ক'রতে পারেন নি। যেন কতকগুলি কথার বুক্‌নি ছাড়া কোন চরিত্রেরই কোন শক্তি নেই। পুরুষগুলি হয়েছে একটি ভ্যাড়ার পাল, মেয়েগুলি হয়েছে কিম্ভূতকিমাকার বিশেষ। প্রতিপাদ্য বিষয়টা ততখানি আক্ষেপের নয়

যতখানি হচ্ছে চরিত্রগুলির হীনতা। যে চরিত্রটি প্রথমটা একটু রক্ত-মাংসের ব'লে বোধ হ'য়েছিল—সেটি নীলিমা, আর সেই জন্যই বোধ হয় অবশেষে তার স্রষ্টা তাকে তেমনই ludicrous ক'রে তুলেছেন।

বিশদ আলোচনার স্থান অবশ্য এটা নয়, আমার উদ্দেশ্যও তা নয়,—এটা একটা apology মাত্র—কেন শেষ প্রশ্নের Parody লিখবার দরকার বোধ করলাম। তাই প্রধান চরিত্র যেটি, যাকে কেন্দ্র ক'রে অন্য চরিত্র-গুলিকে উপগ্রহের মত ঘোরান হ'য়েছে—সেইটির সম্বন্ধে দু'এক কথা ব'লব। সেই চরিত্রটি হচ্ছে কমল। হিন্দু সংস্কার ও হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যখন তখন যেখানে সেখানে, বিদ্রোহ ঘোষণা করাই তার কাজ। আর তাই করবার জন্য একই চিন্তা, বার বার একইরূপ অবস্থা সমাবেশ, নিতান্ত চর্ব্বিত চর্ব্বণ কর্‌বার মত inartistic ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের যে সব কৃতি লেখক এরকম সমাজ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন—কাব্যের মধ্য দিয়ে—তাঁরা তাঁদের চরিত্রগুলিকে এরূপ মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে গ'ড়ে তুলেছেন যে কাব্যটাই বড় হ'য়ে উঠেছে—যেটা বিদ্রোহকে প্রাণস্পর্শী করেছে সেটা কাব্যেরই শক্তি। উদাহরণস্বরূপ একটিমাত্র নভেলের উল্লেখ করছি। গল্‌সওয়ার্দির "ফরসাইট সাগা"। বইটা প'ড়ে পাঠক আইরিনের চিন্তায় ও কর্ম্মে সায় দেবেন। অথচ প্রেমহীন বিবাহিত জীবনটা পাপ, সেরূপ বিবাহিত জীবনে অপর পুরুষের প্রতি প্রকৃত প্রেম হওয়াটাও অতি সত্য বস্তু,—চরিত্রটির মূল কথা হচ্ছে এই। কই সেটা ত পাঠককে আঘাত করে না! মূল কথাটির সঙ্গে যাঁদের মত না মিলবে তাঁরাও আইরিনকে হীন মনে ক'রতে পারবেন না, তার স্রষ্টাকেও দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন না। কিন্তু কমলের প্রত্যেক ব্যবহার, প্রত্যেক কথাটি পাঠককে ও তাঁর বুদ্ধি-কে অপমান করে,—তা অস্বাভাবিক ও অপ্রকৃত ব'লে। কমলের চরিত্র-

টিকে যদিও লেখক অপরের মুখ দিয়ে বার বার "দৃপ্ত তেজ" "নিজস্ব রূপকে জানবার শক্তি" "নির্দ্বন্দ্ব সংযম" "নীরব মিতাচার" "নির্ব্বিশঙ্ক তিতীক্ষা" ইত্যাদি কথাগুলির সাহায্যে একটি halo পরাবার চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু ঐ যা মনে হয়, কথায় চিঁড়ে ভিজে না, সৃষ্টির কারুকার্য্য থাকা চাই। আসল কথা, কমলের চরিত্র, তাহার বাল্যের ইতিহাস, তাহার পারিপার্শ্বিক বেষ্টনী, অবস্থাগুলির back-ground, কোনটিই তাহাকে যথেষ্ট মূর্ত্তিদান ক'রতে পারে নি। তারা দুর্ব্বল ও অকিঞ্চিৎ-কর। অথচ শুধুমাত্র কথার ঝাঁজ ও ভাবপ্রবণতার মধ্য দিয়ে কমল বাজি মাৎ করতে চায়। পাঠক বুঝতে পারেন না—এই অহেতুক গম্ভীরতা হঠাৎ কোথা হ'তে এল, আর কেনই বা এল! অবস্থা সৃষ্টি ব্যতীত ভাবপ্রবণতা হাস্যরসেরই উপাদান—অনুভবের নয়। লেখক যদি কমলকে আরো কম কথা বলাতেন ও তার কথার তাৎপর্য্যটি যথার্থ শিল্পসৃষ্টির দ্বারা প্রতিপন্ন করতে পারতেন—তাকে পাঠক অস্বী-কার ক'রতে পারতেন না। কথাগুলি চকচকে গিল্টিকরা সোনার মত হঠাৎ চমক লাগিয়ে দেয় কখনও কখনও। কিন্তু নিবিষ্টভাবে দেখতে গেলে তাদের অন্তঃসারশূন্যতার কথাই মনে জাগে, কারণ তাদিকে শক্তিমান করবার মত প্রাণ, না আছে চরিত্রটির বা আছে অবস্থাগুলোর। তারপর কমলকে তার কথাগুলি বিশেষ ক'রে বলবার সুবিধা দেবার জন্য যে সব পুরুষ চরিত্র ও যে সব অবস্থার সমাবেশ তিনি ক'রেছেন—তারা শুধু ক্ষীণ নয়, কষ্টকল্পিত। কমলকে ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বাক্‌যুদ্ধে জয়ী করবার জন্য যে সব প্রশ্নোত্তরমালা পুরুষগুলির মুখে দিয়েছেন—সে সবও তাদের মূর্খতা ও চিন্তাহীনতারই পরিচায়ক। তাদিকে আরও মানুষের মত ও বুদ্ধিমান ক'রলে কমলেরও উপকার করা হ'ত, তার কথাগুলিরও দাম বাড়ত। প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের যে চিত্র তিনি

দিয়েছেন—উদাহরণস্বরূপ হরেন্দ্রের আশ্রমের আদর্শ—ওটা একটা নিতান্ত false ideal, আধুনিক সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারের মধ্যে কেহই ওরূপ আদর্শ পোষণ করেন না। ওইখানেই কমলের বিরুদ্ধশক্তির পরিকল্পনাও একেবারে ম্লান ও অর্থহীন হ'য়ে গেছে। অজিত হরেন্দ্র প্রভৃতি যে সব চরিত্র কমলের গৌরববর্দ্ধন করবার জন্য নিযুক্ত হ'য়েছে, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র আভাস দেখি না। ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতির যে ধারণা নিয়ে তারা বিদ্যমান সে সকলই বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত। সভ্য হিন্দু সমাজে ওরূপ চিন্তা ও সংস্কার আরোপ করতে যাওয়াটাও সঙ্কীর্ণতা ও উদ্দেশ্যহীন বিদ্বেষের পরিচায়ক। তারপর বুদ্ধির পবিত্রতা, যেটা নাকি নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেও মহিমান্বিত করে, তা না থাকলে এরকম ধরণের বই অসতের অনুভবই জাগ্রত করে। কমলের কথাবার্ত্তা সর্ব্বদাই coquetting, দৃশ্যমান শুচিতার অন্তরালে সর্ব্বদাই অশুচি। হরেন্দ্র, রাজেন্দ্র কাহাকেও সে বাদ দেয় নি—সকলের সঙ্গেই, ভালবাসায় নয়, শুধু তাদের চিত্ত আকর্ষণ করবার মোহেই এমন সব কথা বল্‌ছে—যা যৌনভাব ব্যতীত আর কিছুই suggest করে না,—অথচ তখনই আবার বল্‌ছে সে ওরকম ভাবের উপরে। শুধু কথায় নয়, সৃষ্টি সামঞ্জস্যের অভাবে দু'রকম কথাই নিতান্ত ridiculous হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সে যেন sexualism এর একটি Prophetess—যৌনভাবের জয়জয়কারই তার জীবনের মহাব্রত। কিন্তু আবার এদিকে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে সে এমন হাস্যকরভাবে penance সুরু করেছে আর অযথা স্থানে অস্থানে তাই প্রচার করছে যে তার কোন অর্থই হয় না। লেখক হয়ত ভেবেছিলেন এরূপ করলে তার চরিত্রের শক্তিটা খুব বেড়ে যাবে। তা কিন্তু মোটেই হয় নি। ওরকম আচরণ উপহাসের বস্তুই হ'য়েছে। কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি,—অপরিচিত রাজেনের সম্মুখে

হঠাৎ অযাচিত তার বিবাহের আধ্যাত্মিক ইতিহাস বর্ণনা, হঠাৎ টুণ্ডলায় তার পিতার পরিচিত ফিরিঙ্গি সাহেবের সংসার গুছাতে উধাও হওয়া প্রভৃতি এই সব situation, কমলের চরিত্রকে উজ্জ্বলতর করবার উদ্দেশ্যে কল্পিত হ'লেও তারা তাকে আরও হাস্যজনক ক'রে তুলেছে। নীলিমার মুখের প্রশংসাবাদ অথবা অপরের মুখে তার প্রতি অকপট বিশ্বাসের কথা—কিছুই অবস্থাগুলির অস্বাভাবিকত্ব লাঘব করতে পারে নি। রাজেন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুর উপায় উদ্ভাবনটাও বিশ্রী লাগে। যেন কমলের শেষ আক্রমণটা তীব্র করবার নেশাতেই লেখক হঠাৎ একটি out of place scene introduce করেছেন। পাঠক তার প্রতি conscious না হ'য়ে পারেন না। ওরকম ক'রে effect create করা যায় না। চিন্তা জগতে একটি নূতন যুগ আনবার মিথ্যা আকাঙ্ক্ষায়— যদিও তা মোটেই নূতন নয়, বহুকাল পূর্ব্বে থেকে হেনরিক ইবসেন প্রমুখ পাশ্চাত্যের অনেক লেখক ওসব কথা ব'লে, আসছেন—যাই হোক এইরকম একটা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার সৃষ্টি করছি মনে ক'রে লেখক যেস্থানটিতে এসে পড়েছেন তা অত্যন্ত শোচনীয়। শিল্পকেও জলাঞ্জলি দিয়েছেন, উদ্দেশ্যটারও মাথা খেয়েছেন। শিব গড়তে বাঁদর গ'ড়ে বসেছেন।

উদ্দেশ্যমূলক কাব্য কখন মহৎ কাব্য হ'তে পারে না,—অন্ততঃ উদ্দেশ্যটা যদি subordinate না হ'য়ে থাকে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই বইটি হয়েছে পুরোপুরি didactic. তিনি প্রত্যেক পদেই নিজেকে ধরা দিয়েছেন, অকারণ উপদেশের উষ্মা প্রত্যেক স্থলেই প্রকাশ পেয়েছে। আর্টিষ্ট তাঁর সৃষ্টির অন্তরালে নিজে না অপ্রকাশ থাকলে আর্ট অত্যন্ত রূঢ় লাগে। শরৎচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভার দুর্দ্দিন সুরু হয়েছে সেই দিন থেকে যেদিন তিনি তাঁর লেখায় didacticism সুরু

করেছেন। তা চল্‌তি সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হ'লেও—প্রধানতঃ সেটা উপদেশাত্মক। লেখকের একটা মতবাদ আছে—থাকুক তাতে ক্ষতি নাই, মানুষ মাত্রেরই থাকা উচিত, কিন্তু তাই প্রকাশ করবার জন্যই তিনি উপন্যাস লিখছেন। এর জন্য সমালোচনা, শাস্ত্র, প্রবন্ধ এ সব আছে, শিল্পসৃষ্টির মধ্যে ওরূপ করতে গেলে রসগ্রাহীর নিকট তাহা অত্যন্ত কুৎসিত হয়ে পড়ে।

যাক্, উদ্দেশ্যটা কি, তাই এবার সংক্ষেপে ব'লছি। তা হচ্ছে হিন্দুর ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কার, চিন্তা,—লেখক যেটাকে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব ব'লে প্রকাশ করছেন, এক কথায় হিন্দুত্বের গন্ধ যাতেই আছে, at a stroke সে সকলেরই ধ্বংস-সাধন। হিন্দু সংস্কারটাকেই আক্রমণ করা হয়েছে, কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতির বিরুদ্ধে কোন যুক্তি প্রয়োগ না করেই এক ঢিলে দুই পাখী মারবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। কমল সর্ব্বদাই একটি motiveless আক্রোশ নিয়ে ফিরছে, হিন্দুর যোগ, দর্শন, শাস্ত্র প্রভৃতি কিছুই সে আক্রমণ ক'রতে ছাড়ে নি, যদিও তার যুক্তিগুলি সর্ব্বদাই কালধর্ম্মে পরিবর্ত্তনশীল আচার অনুষ্ঠানেরই বিরুদ্ধে। যা পরিবর্ত্তনশীল ও বাহ্য তার বিরুদ্ধে কলম ধারণ করে', যা অপরিবর্ত্তনশীল, সত্য ও জ্ঞানের অনুশীলন—শরৎচন্দ্র তাকেই অপমান করেছেন। এরূপ করবার কারণ কি? অথচ তাঁর যুক্তিগুলি অত্যন্ত fallacious,—তাদের মূল support হচ্ছে বাইরে থেকে সংগ্রহ করা কতকগুলি উপমা, যথা—"সূর্য্যমুখী ফুলের আয়ু" "সূর্য্যাস্ত বেলায় মেঘের গায়ের রং"—"পশ্চিমের দরজা খুলে সূর্য্যোদয় দেখাবার চেষ্টা"—ইত্যাদি। মানুষের স্বভাব ও চিন্তা এবং তার নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞাপন ঐরকম অপ্রাসঙ্গিক কতকগুলি উপমা দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলে ঘোড়ার সহিত আমের তুলনামূলক বিচারবুদ্ধিটাই প্রকাশ পায়। সমাজ অন্যায়ে পূর্ণ হতে

পারে, তার সংস্কার হাজার প্রকারে প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম ও সমাজ একই বস্তু নয়, এককালে ধর্ম্মের উপর সমাজ-শাসনের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা একেবারে বিভিন্ন বস্তু। হিন্দুর ধর্ম্মের উপর লেখকের এত আক্রোশ কেন তা বুঝতে পারি না। তবে যতদূর বুঝেছি তিনি সংযম, ত্যাগ ও বৈরাগ্য এইগুলির উপর হাড়ে চটা। এটা তাঁর বুঝা উচিত যে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-হিসাবে ও সব হিন্দু সমাজে কোন যুগেই আচরিত হয় নি। যাঁরা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অনুশীলন করতেন তাঁরা স্বতঃই ভোগবিলাস পরিত্যাগ করতেন, সর্ব্বদেশের মনীষীরাই করেছেন, আজও করে থাকেন। কিন্তু যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের চিত্র শরৎচন্দ্র এঁকেছেন—সেটা ত্যাগও নয়, বৈরাগ্যও নয়। কোন সভ্য মানব তা মনে করেন না। বুদ্ধের ত্যাগ, চৈতন্যের ত্যাগ, বিবেকানন্দের ত্যাগ, আর হরেন্দ্রের আশ্রমের ত্যাগ-প্র্যাক্‌টিস্ একই জিনিষ নয়। ভারতবর্ষের বেদান্ত-দর্শন, কাব্য, ইতিহাস, শিল্প, সঙ্গীত—এরা কেহই আজও মৃত নয়, কোন সভ্য মানব তা অস্বীকার করবেন না। ভারতের renaissance যে নিজ চিন্তা ও ভাবধারাকে অতিক্রম করে অন্য পথ অবলম্বন করবে বা করলে তার "পূর্ব্বদিকের জানালা" একেবারে খুলে যাবে—যাঁরা বর্ত্তমান ভারতের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের কেহ এরূপ ভাবতেও পারবেন না। পাশ্চাত্যের নিকট গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই—এমনও মনে করা অসম্ভব, আর ভারতের স্বকীয় চিন্তা ও সাধনা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য—এরকম ধারণা পোষণ করাটাও মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ। যে কমলের মুখ দিয়ে তিনি এসব কথা বলিয়েছেন সেই আবার স্বীকার করছে যে ওসব চিন্তা, কর্ম্ম ও সাধনার সহিত তার পরিচয় নাই, অথচ সে যেন নিজের সংস্কারজাত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝেছে যে ও সবই অত্যন্ত হীন। এ রকম অভিজ্ঞতার উৎস কোথায়—তা ত ভেবে পাই না।

বইটির ৩৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য:—"যোগ কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু এ যদি নির্জ্জনে বসে কেবল আত্মবিশ্লেষণ ও আত্ম-চিন্তাই হয়, তো, এই কথাই জোর করে বলবো যে এই দুটো সিংহ-দ্বার দিয়ে সংসারে যত ভ্রম, যত মোহ প্রবেশ করেছে, এমন আর কোথাও দিয়ে না। ওরা অজ্ঞানের সহচর।"

বাস্তবিক এরূপ উদ্দেশ্যহীন, অনুদার এবং বিচারহীন উক্তি সাহিত্যের কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অন্য কেউ বললে— উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু বলছেন এমন একজন যাঁর প্রভাব বাংলার তরুণদের মনের উপর either for good or evil অত্যন্ত বেশী। তারপর আর একটা লোমহর্ষণকর theory, বিবাহটা একটা কুসংস্কার—মনের জড়ধর্ম্ম। যতদিন ইচ্ছা যে যার কাছে থাক, তারপর বাস্ সরে পড়। এটা বুঝান হয়েছে প্রায়ই একটি উপমা দিয়ে —বিবাহটা নাকি একটি ভয়ানক মজবুত নিরেট নিশ্ছিদ্র বাড়ীর মতন, "ওতে মড়ার কবর তৈরী হয়, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হয় না," (৩৯৬ পৃষ্ঠা)। আগেই বলেছি এরূপ উপমামূলক বিচারটা মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রলে বেগুন গাছে বেগুন হয়, পটল হয় না কেন— কতকটা এই রকম ধরণের হ'য়ে দাঁড়ায়, বিশেষ ক'রে উপমাগুলিই যখন বিচারের একমাত্র অবলম্বন। যাক্ ও তর্কের মধ্যে আমি প্রবেশ ক'রতে চাই না, এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হব যে কোনও সভ্য মানব বিবাহিতা মাতার গর্ভে জন্মান নি, অথবা পিতার নাম সঠিক বল্‌তে পারেন না—এমনটা যথেষ্ট গৌরবের বস্তু মনে করবেন না। অন্ততঃ ঐটাকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ভাবে গ্রহণ ক'রতে হবে, যাকে যখন ভাল লাগবে তার সঙ্গে তখনই প্রেম ক'রব আর তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল যা অবশ্য তাই হবে, এক একটি মেয়ের heterogeneous পুত্রকন্যার

শেষ শ্রাদ্ধ

১

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন চিন্তা লইয়া, বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন ভাবে প্রণোদিত, ততোধিক বিভিন্ন প্রকৃতির বাঙালী আগ্রা সহরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তবে অনেক দিন একত্রে বসবাস করিতে থাকায় একান্ত সাহচর্য্যের গুণে সকলেই একই প্রকার চিন্তায় পটুত্ব, এবং একই-রূপ ভাবের চর্চ্চায় উৎকর্ষলাভ করিতেছিলেন। উক্ত সহরের যত কিছু ঐতিহাসিক আশ্চর্য্য সব দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদের নিকট একেবারে পচিয়া গিয়াছিল। যত লোক অন্ধকার রাত্রে তাজমহল দেখিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে, যেখানে যত বেগমের প্রসব-ব্যথার পবিত্র স্মৃতি পাথরের আঁতুড়ঘরগুলি মাতাইয়া রাখিয়াছে—সবই তাঁরা জানিতেন। কাজেই নিতান্ত একঘেয়ে ঠেকিতেছিল। কিন্তু সেই একঘেয়েমি কাটিল সেইদিন যেদিন বেহারা বাবুর্চ্চি খান্‌সামা চাকর চাকরাণী দরোয়ান ব্রাহ্মণ ঘোড়া সহিস ইত্যাদি লইয়া ষাট বৎসরের বিপুল বাতগ্রস্ত বৃদ্ধ বাঙালী-সাহেব আশুতোষ গুপ্ত তাঁর যুবতী কন্যা মনোরমার সহিত আগ্রায় আসিয়া পৌছিলেন। আগ্রার বাঙালীমহল

আশুবাবুর ঘোড়ার গাড়ী অথবা মনোরমার দুর্দ্দান্ত যৌবন লক্ষ্য করিয়াই আশ্চর্য্য হইল না, তাহারা অবাক মানিল এই দেখিয়া যে ইহারা উভয়েই যাচিয়া সবার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। পথে-ঘাটে কোন অপরিচিত বাঙালীকে দেখিলেই তাঁরা "কি মশায় কোথায় যাওয়া হচ্ছে,—আরে আসুন অসুন, এক পেয়ালা চা খেয়ে যান, খাবেন না? তবে দু'টো পান—না এতে আপত্তি ক'রলে চল্‌বে না"—ইত্যাদি-রূপ অভ্যর্থনাদ্বারা আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ বৃদ্ধটি বড়ই মাইডিয়ার লোক, আর তাঁর কন্যার ত কথাই নাই, কি করিয়া সকলকে খুশী করিবে ইহাই সে খুঁজিতেছে। সে কথা কহিলে লোকে ভাবে বোধ করি পায়রা ডাকিতেছে, হাসিলে ভাবে, বোধ করি কচি ঘাসের উপর লণ্ঠনের আলো ছড়াইয়া পড়িল। মোটের উপর মনটাকে একেবারে না ভিজাইয়া ছাড়িয়া দেয় না। দিন কতক পরে এমন হইল যে, দিন নাই রাত্রি নাই, আগ্রার যত বাঙালী ভদ্রলোক সকলেই আশুবাবুর ঘরে পড়িয়া থাকিতে লাগিলেন, কারণ সকলেই ইহা লক্ষ্য করিলেন যে জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ইনি ধর্ম্মাধর্ম্ম, নীতিদুর্নীতি সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বিকার হইয়াছেন।

অবিনাশ মুখুজ্জে কলেজের প্রফেসর। তিনিও অত্যন্ত সদানন্দ-প্রকৃতির লোক। স্ত্রীবিয়োগ হইবার পর বিধবা শালীটিকে লইয়া আসেন আগ্রায়। শ্যালিকাটির নাম নীলিমা। সে তার স্বর্গগত স্বামীকে মনে মনে পূজা করিয়া অহর্নিশি পরকালের কাজ করিত বটে, কিন্তু ভগিনীপতির ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া ইহকালটা তাঁহাকেই উৎসর্গ করিয়াছিল। গত্যন্তর ছিল না, আর অবিনাশ বাবুও পরলোকগত স্ত্রীর স্মৃতিকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সর্ব্বত্রই তাঁর ছবি

টাঙাইয়া রাখিয়াছিলেন। কোন ঘরের দেওয়াল ফাঁক যায় নাই, যায় গোসোলখানাটি পুর্য্যন্ত,—এম্‌নি করিয়াই শ্যালিকাপ্রেমের চূড়ান্ত প্রতিশোধ তুলিতেছিলেন।

সেদিনটা ছুটি। অবিনাশ ইয়ার-বন্ধুদের লইয়া তাসের আড্ডা জমাইয়াছিলেন—এমন সময় আশুবাবুর গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। আশুবাবু তাঁর বিপুল শরীর লইয়া অতি কষ্টে ঘরে ঢুকিয়াই একটি আরাম চেয়ারে ধপ্‌ করিয়া পড়িয়া গেলেন। মনোরমাও সঙ্গে আসিয়াছিল, স্থানাভাব বশতঃ সে একটি চেয়ারের হাতলের উপর ভর দিয়া বসিল—অর্থাৎ বসিল কি দাঁড়াইয়া রহিল—ঠিক বুঝা গেল না। আশুবাবু বলিলেন, "আজ আমার বাড়ী গান বাজনা হবে, আপনাদের সকলকে একটু মিষ্টিমুখ করে আসতে হবে যে! মিঠেকড়া, নরম গরম সব রকম ব্যবস্থাই করেছি। যাঁরা প্রেজুডিস্‌ওয়ালা তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত, মণি, যাও ভিতরে মেয়েদের বলে' এস।" অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আমার ঘরে স্ত্রী ত নেই, তবে বিধবা শালীটি আছেন বটে, কিন্তু তাঁর আবার খাওয়া ছোঁয়ার যে বিচার—"

আশুবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, "সে কি কথা, আমার মণিও যে মাছ মাংস খায় না, বাবাজীটি সন্ন্যাসী গোছের লোক কিনা!" মনোরমা লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, "কি যে আবোল তাবোল বক্‌ছ বাবা, তোমার কি বুড়োবয়সে ভীমরতি হয়েছে!"

তারপর এঁরা চলিয়া গেলেও উল্লিখিত "বাবাজী"টির কথায় সকলে বেশ একটু মুস্‌ড়িয়া গেলেন। এই উপগ্রহটি আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল! যাই হোক্‌, উপস্থিত মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই মনে করিয়া আবার তাস মেলা হইল। নীলিমা পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বোধ করি সবই শুনিতেছিলেন—এইবার পর্দ্দা ঠেলিয়া ভিতরে

আসিলেন। খাসা চেহারা। যৌবন যেন যাই যাই করিয়াও যাইতে পারে নাই এবং যাইবার আগে তার শেষ রশ্মির আভায় এই বালবিধবার দেহলতাটিকে একান্ত অনুরাগে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। আধ্‌ধির সাদা এম্‌ব্রয়ডারির উপর পাত্‌লা থান কাপড়ের মধ্যেও রং যেন ফাটিয়া বাহির হইতে চায়। পিঠময় ছড়ানো কোঁকড়া কালো চুল। এই-মাত্র পান ও দোক্তা খাইয়াছিলেন বোধ করি, তাই ঠোঁটের রংটিও সূর্য্যাস্তের মতই লাল। ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বেশ ত আড্ডা দেওয়া হচ্ছে, সন্ধে-বেলার ব্যবস্থাটাও ত মন্দ হবে না যা শুন্‌লাম, এদিকে বেলা যে দু'টো বাজে, কতক্ষণ হাঁড়ি নিয়ে বসে' থাক্‌ব শুনি? লোকে যে নিজের বউএর উপরেও এত অত্যাচার করে না!"

২

অবিনাশ বলিলেন, "হুঁ, কিন্তু শালীর উপর করে। তুমি কি ডেকেছ হে, থ্রী-স্পেডস, আচ্ছা আমি থ্রী নোট্রাম্পস্।"

আশুবাবুর বাড়ীতে রীতিমত গানবাজনার আসর জমিয়াছে। হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের সমাগম দেখিয়া প্রথমটা সকলে একটু বিরক্তভাব প্রকাশ করিতেছিলেন। ওরা ত আগ্রায় আসা অবধি কান ঝালাপালা করিয়া ছাড়িয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। আশুবাবু বলিলেন, "শুধু এই শুন্‌বার জন্য আপনাদের আজ আহ্বান করি নি, আশ্চর্য্য জিনিষ আজ শোনাব—যা আপনারা বাপের বয়সেও শোনেন নি,"—বলিয়া

তিনি পাশের ঘরের পর্দ্দা তুলিয়া দেখাইলেন, একটি অনিন্দ্যসুন্দর কৃষ্ণকায় ব্যক্তি সোফার উপর মনোরমার সহিত পাশাপাশি বসিয়া হাসি-তামাসা করিতেছেন, উন্মুক্ত পর্দ্দার বাহিরে উৎসুক ভদ্রমণ্ডলীকে তাঁরা বিশেষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনিলেন না। অবিনাশ নিম্নস্বরে বলিলেন,—"এ যে গুণী শিবনাথ!" শিবনাথ তখন মনোরমার চিবুকটি ধরিয়া একবার নাড়িয়া দিয়া বলিলেন "এখন তবে উঠি?"

তারপর সুরু হইল শিবনাথের গান। সে ঠিক গান নয়, সে যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, কানে শুনিতে না শুনিতে সোজা বুকে আসিয়া তীরের ন্যায় বিঁধে এবং তৎক্ষণাৎ শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। গানের অসহ্য প্রভাবে মনোরমার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। বাস্তবিক সে আর সহিতে পারিল না। শ্রোত্রীমণ্ডলীর সকলেই অল্পবিস্তর বাষ্পাকুল নেত্রে ফোঁস ফোঁস করিয়া ফুলিতেছিলেন, মনোরমা গানের মাঝখানেই ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। দুইজন বেহারা আসিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল। সেথায় সে দুর্নিবার সঙ্গীতের প্রাণান্তকর প্রেরণায় আছাড়-কাছাড় করিতে লাগিল।

গানের শেষে কাঁদকাঁদ মুখ করিয়া সকলে খাইতে বসিলেন। শিবনাথ প্রথমটা ক্ষুধা নাই বলিয়া খাইতে বসেন নাই, তাবপর মনোরমা উঠিয়া আসিয়া একবার অশ্রু-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে অনুরোধ করিতে অগত্যা আহারে বসিলেন, এবং কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে সকলের অলক্ষ্যে খাদ্যদ্রব্যগুলি থালার নীচে পূরিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ক্ষুধা যে তাঁহার ছিল না তাহা নহে, গান গাহিলেই তাঁহার গা-টা কেমন বমি বমি করিত।

আশুবাবু বলিতেছিলেন, "শিবনাথ অদ্বিতীয় গুণী, নয় মণি?"

মনোরমা চোখ মুছিয়া—তাহার কান্নার আবেগটা এখনও থামে নাই—নাকি-কান্নার সুরে বলিল, "হ্যাঁ।"

অক্ষয় নির্লজ্জ স্পষ্টবাদী লোক, সে বলিল, "Geniusটাই ত মানুষের সব নয়, চরিত্রটা আরও বড় জিনিষ।"

সকলে বাধা দিয়া বলিল, "থাক্ থাক্ এসব আলোচনা।" শিবনাথ কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "কেন, থাক্‌বে কেন? শুনে রাখুন আশুবাবু, মদ খাওয়ার জন্য আমার কলেজের চাকরিটা গেছে, নেশার ঝোঁকে একদিন প্রিন্‌সিপ্যালকে বলেছিলাম—'শালা।' তারপর আমারই পাড়ার একটি চাকরাণীর রূপসী মেয়েকে নিয়ে বাস কর্‌ছি। কিন্তু এতে অপরাধটা কোথায় শুনি? হতভাগা সাহেব বুঝলে না যে কত আত্মীয় ভেবে তাকে অমন কথাটা ব'লেছিলাম; আর যার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে—সে একথা মান্‌বে যে দু'টো মন্ত্র পড়ে' এক রাত্রের মধ্যে একটি মেয়েকে স্ত্রী বানিয়ে নেওয়া চলে, কিন্তু তাতে প্রেম হয় না, পাঁঠা বলি হয়। আমার সঙ্গে যেটির বিবাহ হয়েছিল তার নাকটাও থ্যাব্‌ড়া আর ডেঙ্গু জ্বরে ভুগে চেহারাটি হ'য়েছিল ঠিক আস্ত পেত্নীর মত। একদিন একটি পাঁঠা ধরে এনে তার সামনে বলি দিয়ে বলেছিলাম—মা, কালীঘাটের কালী রক্ষা কর মা, আর ভয় দেখিয়ো না, হয় তুমিই অন্তর্ধ্যান কর—না হয় আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরি। সেই রাত্রেই অবশ্য গলায় দড়ি দিয়েছিলেন তিনি—আমি নয়।"

অবিনাশ বলিলেন, "এখন তবে করা হচ্ছে কি?"

"পাথরের ব্যবসা। আমার বাল্যবন্ধু যোগীনবাবুর ব্যবসাটা মোকদ্দমা জিতে আমিই পেয়েছি কি না।"

"আর তাঁর বিধবা স্ত্রী ও ছেলেরা?"

"প্রথমটি ত মোকদ্দমা না জিতেই পেয়েছিলাম—তবে খুব বেশী দিন নয়, কারখানার একটি বুড়ো মুসলমানকে তিনি পছন্দ করলেন বেশী। দ্বিতীয়টির খবর জানি না। খালিম, চপ্‌টা বেড়ে রেঁধেছ হে, আর দু' একখানা দাও ত দেখি।"

মনোরমার বড় ঘুম পাইতেছিল। অতিরিক্ত কান্নার পর স্নায়বিক অবসাদে ওরূপ হয়। সে হাই তুলিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, শিবনাথ খপ্‌ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "সে হচ্ছে না, কেমন যাও ত দেখি!" এই বলিয়া একটুক্‌রা চপ তাহার মুখে তুলিয়া দিলেন। মনোরমা চপখানি মুখে করিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

৩

ইহারই সাত আট দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় মুষলধারে জল পড়িতেছিল। তাহাতে ভিজিয়া শিবনাথ তাঁহার পূর্ব্বকথিত পাড়ার চাকরাণীর রূপসী মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া আশুবাবুর বাটী আসিয়া উপস্থিত। বর্ষার জলসিক্ত সেই দুইটি অপরূপ সুন্দর নরনারীর মূর্ত্তি পাশাপাশি দেখিয়া, (একটি যেমন কালো অপরটি তেমনি ফর্সা, কিন্তু তাহাতেই কালো টুপির উপর লালফিতার ন্যায় মানাইয়াছে চমৎকার,) আশুবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁর বার্দ্ধক্যের বোঝা ঠেলিয়া দিয়া জীর্ণদেহের মরা-গাঙের জোয়ারে চিন্তার তরণী ভাসাইয়া দিলেন। এক পলকে অনেক কথা ভাবিলেন, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথাটি

এই যে, বাস্তবিক ইহারা আজ হিন্দুসমাজের চোখে যতই ইতর বা ছোটলোক হোক না কেন, ইহাদের এই নশ্বর নরদেহের মধ্যে কামুকতার কি অবিনশ্বর সত্যই না ফুটিয়াছে! যে দেশের লোকেরা আধ্যাত্মিক চিন্তার ধোঁয়ায় মাথাটাকে ঘোলাটে করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা রক্তমাংসের মধ্যে প্রবৃত্তির এই জয়যাত্রার মূল্য বুঝিবে কি? কিন্তু চিন্তাচ্ছন্ন ভাবটি হঠাৎ কাটাইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে আশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, "যদু, যদু, বাবুকে আমার বাথ্‌রুমে নিয়ে যা।"

মনোরমা ইতিমধ্যে আসিয়া শিবনাথের সঙ্গিনীটিকে লইয়া গেল এবং ঝিকে বলিল একটি কাপড় দিতে। মেয়েটি কিন্তু হাসিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া কহিল, "আমাকে কিন্তু ভাই একখানি ফর্সা কাপড় দিতে হবে, আর একটা নতুন সাবান, যার-তার গায়ের সাবান মাখলে ব্যামো হয় মাইরী।"

মনোরমা বোধ করি তার হাত-পা ইত্যাদি দেখিতেছিল—মুখটি দেখে নাই। দেখিলে দেখিতে পাইত একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের প্রভাবে তাহার মুখটি একান্ত ঘোলাটে ভাব ধারণ করিয়াছে, মট্‌কার চাদরে *ধোপারা জলের কষ ধরাইয়া দিলে দেখিতে যেরূপ হয়—ঠিক সেইরূপ।*

মনোরমা আশুবাবুর ঘরে উভয়কে বসাইয়া দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া আনিল। শিবনাথ বলিলেন, "থাক, এক পেয়ালাতেই হবে। উনি ত আর চা খান না, ঠাণ্ডা জল বরং একগ্লাস ওঁকে এনে দিন।"

মেয়েটি জলের গ্লাস হাতে লইয়া চায়ের ন্যায় অল্প অল্প চুমুক দিতে লাগিল। আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "গরম লাগছে কি?"

"না।"

"তবে ওরকম করছ যে!"

"এমনি।"

৪

সেদিন কি একটা পর্ব্বোপলক্ষ্যে হিন্দুস্থানী রমণীপুঞ্জ যমুনাতীরে সমবেত হওয়ায় হরেন্দ্র অক্ষয় প্রভৃতি প্রফেসরমণ্ডলী, কাহার গায়ের গহনা কত মণ ওজনের, কাহার ঘাঘ্রা কত বৎসর রজকের মুখ দেখে নাই, ইত্যাদিরূপ প্রাত্নতত্ত্বিক গবেষণার-আকাঙ্ক্ষায় অতি প্রত্যূষে সেখানে গিয়াছেন। এদিকে আশুবাবুর ভাবী জামতা, মনোরমার বাগদত্ত বর শ্রীমান অজিতকুমার, বিলাত হইতে ফিরিয়া কাশী গিয়াছিল, সেখানে মস্তকমুণ্ডন ও প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্য সমাধা করিয়া সম্প্রতি আগ্রায় আসিয়াছে। মনোরমা এতদিন তাহারই পথপানে চাহিয়া নিষ্কলুষ ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করিতেছিল। এমন কি মেরি ষ্টোপস্ ও মোপাসাঁর দু'একটি বই ছাড়া কিছুই হাতে করে নাই। কিন্তু হঠাৎ প্রবাসপ্রত্যাগত তাহার এই বাগ্দত্তটিকে দেখিয়া যেন বড় বেশী দমিয়া পড়িল। অজিতকুমার এদিকে কতকটা মোটা বুদ্ধির লোক হইলেও মনোরমার বিমর্ষ ভাবটি লক্ষ্য করিল, কিন্তু ওটা নারীচরিত্রের একটা বিশেষত্ব কল্পনা করিয়া তেমন গ্রাহ্য করে নাই।

অজিত তাহার ভাঙা মোটরখানা মেরামত করিতে সেদিন ব্যস্ত ছিল। বিলাতে সে এই বিদ্যাটায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ফিরিয়াছিল। বোধ করি তাহাই একটু গর্ব্বের সহিত প্রতিপন্ন করিবার জন্য মোটর মেরামত অন্তে কাপড়ে চোপড়ে কালির দাগ লাগাইয়া ভূতের ন্যায় আশুবাবুর সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু তখন অবিনাশের সহিত তাজমহল যাইবার যুক্তি করিতেছিলেন। অজিতের

সেই বেশ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, "অজিত, এঁকে প্রণাম কর, ইনি একজন পূজনীয়-চরিত্রের লোক।" অজিত প্রণাম করিয়া কহিল, "মোটরটা প্রায় প্রস্তুত, চলুন এইবার তাজমহল দেখতে যাওয়া যাক।"—

এমন সময় বাসি ফুলটির মত মুখখানি লইয়া মনোরমা প্রবেশ করিতেই অজিত সাহেবী কায়দায় নতজানু হইয়া তাহার বাঁ হাতটি টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। মনোরমা চক্ষু বুজিয়া সেই হাতখানি পুনরায় নিজের ওষ্ঠে স্পর্শ করিল। কিন্তু অজিতের কালিমাখা হাতের স্পর্শে তাহারও হাতে মোটরের কালি লাগিয়াছিল, সেই হাতটি ঠোঁটে লাগাইতে নাকের নীচে দাগ লাগিয়া এমন হইল যে—যেন ভিনাসের অনবদ্য সুন্দর পাষাণপ্রতিমার মুখে কোন বদমায়েস ছোক্‌রা গোঁফ আঁকিয়া দিয়া পলাইয়াছে। বড় মর্ম্মান্তিক ব্যাপার—প্রাণের ফোয়ারা গলিতে গলিতে যেন জমাট্‌ বাঁধিয়া গেল।

অনতিকাল পরে মোটরযোগে সকলেই যমুনাকূলে আসিয়া হরেন্দ্র অক্ষয় প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। আশুবাবু ঘাসের উপর কাত হইয়া বলিলেন, *"বাস্‌ আর একটি পাও নড়্‌ছিনে বাবা, এইটুকু আস্‌তেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।"* মনোরমা ছাড়িবার পাত্র নহে, অত্যন্ত পীড়াপীড়ি সুরু করিল। কিন্তু এমন সময় তাজমহলের ওদিক হইতে শিবনাথ ও তাঁর পাড়ার ঝির মেয়েটি ইহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা নিকটে আসিলে আশুবাবু চাড়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, আদর করিয়া তাঁহাদের সহিত সকলকার আলাপ করাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইনিই শিবনাথের—কি বলে—ইয়ে, আহা যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ। তোমার নামটি কি ভাই?" বলিয়াই আবার কতকটা কাত হইয়া পড়িলেন।

সে কহিল, "কমল. 'তবে শিবনাথ বাবু আদর ক'রে ডাকেন শিবানি বলে'।" যেমন সপ্রতিভ, তেমনি তীক্ষ্ণ ইহার উক্তি।

"শিবানি! গ্রিকার নামটা। আমি আরও ছোট ক'রে ডাকব—শিবু, কি বল?"

ঘাড় নাড়িয়া কমল জানাইল ইহাতে তাহার আপত্তি নাই।

"তুমি বুঝি—এই প্রথম তাজমহল দেখলে?"

"হাঁ।"

"তবে বড় ভাগ্যবতী তুমি। কি একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম, কি উদগ্র ব্যথায় ঐ তাজমহলের পাথরের বুকটা আজও টন্‌টন্ করছে। এমন ত শুনেছি যে বয়সকালে বেঙাচিরও ল্যাজ খসে যায় কিন্তু কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে পত্নীপ্রেমের ব্যথায় বিবর্ণ ওই তাজমহল, ওহো",—এই বলিয়া ভাবের আবেগে থামিয়া গেলেন, আর কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু এমন জোরে এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন যে অজিত চমকিয়া উঠিল, তাহার সত্যসত্যই বোধ হইল যেন নিকটে কোথাও মোটরের চাকা ফাটিয়া গেল। সদা-সর্ব্বদা মোটরের কারখানায় কাজ করিয়া তাহার স্নায়বিক ক্রিয়ার উপর এমন একটি স্থায়ী পরিণাম দেখা দিয়াছিল যে কিছু একটা ঘটিলেই তাহার মোটর দুর্ঘটনার কথা মনে হইত।

কমল জবাব দিল, "কিন্তু আমি সে-চোখ দিয়ে তাজমহল দেখি না।"

"কেন?"—আশুবাবু এইবার চোখ মেলিয়া চাহিলেন। বিস্মিত নেত্রে তিনি দেখিলেন অস্তসূর্য্যের রশ্মির আভায় উত্তরকারিণীর কানের দুল অপরূপ দীপ্তি বিকীরণ করিতেছে। মনে হইল যেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, কর্ণভূষণের রশ্মি সূর্য্যে পড়িয়াছে অথবা সূর্য্যের

রশ্মি কর্ণভূষণে পড়িয়াছে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি প্রফেসর আইনষ্টাইনের মতানুযায়ী ভাবিতেছিলেন সবই হয়ত relative, ওই কানটি, তাহার ছিদ্রটি ও দুলটি কোনটাই absolute নয়, মেয়েটি এইমাত্র যে কথা বলিল, সে হয়ত বলে নাই, তাঁহার মতিভ্রম, ইত্যাদি গুরুতর চিন্তার জাল তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। কিন্তু তাহা ছিন্ন করিয়া মেয়েটি কাঁসির মত তীব্র কণ্ঠে বলিল, "আমি দেখি সাজাহানের অনেক দিনকার কোমরের বাত আরাম হল—সেই উল্লাসে এই তাজমহল গড়েছিলেন। তা না হ'লে একজন বিশেষ কোন মানুষের প্রেমে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক। চিরকাল ধরে' একটি লোকের স্মৃতিকে রক্ষা করবার কোন অর্থ হয় না। একটি লোককে ধরে' আজীবন পড়ে' থাকাটা প্রেম নয়—প্রেমের মৃত্যু। জীবন্ত প্রেম প্রত্যহ নূতন খাদ্য চায়, কালকের পচা মাংসকে সে টাটকা বলে' গ্রহণ করে না। মোটের ওপর পয়সা থাকলে আমিও রোজ একটা করে' তাজমহল গড়তাম, মমতাজের প্রয়োজন হ'ত না। পদি-পিসির গঙ্গাযাত্রা উপলক্ষেও এটা হ'তে পারত, ধাপার মাঠে এবছর বড় বড় বেগুন জন্মাবার উপলক্ষেও এটা হতে পারত।

এ ভাষার জবাব কেহ খুঁজিয়া পাইলেন না। বিস্ময়ে পুলকে সকলের কণ্ঠরোধ হইল। অক্ষয় অসহিষ্ণু প্রকৃতির লোক, মরীয়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু যে প্রেমের কথা আপনি বললেন, ওটা প্রেম না প্রবৃত্তির ব্যভিচার?" কমল বলিল—এবার অধিকতর উষ্মার সহিত, "ও একই কথা অক্ষয়বাবু, আজ রাম, কাল শ্যাম, পরশু যদু, তারপর দিন মধু এই রকম প্রত্যহ যদি নূতন লোক এক একটি নবীন সূর্য্যের মত আমার জীবনের পূর্ব্বদিকটা না রাঙিয়ে তোলে তবে

সেটাকে প্রেম বলব না, বলব গোরস্থান। এর ব্যতিক্রমটা অপরের চোখে শোভনও নয়, সুন্দরও নয়, ওর মধ্যে আর যেই থাক আমি নেই, বুঝলেন অক্ষয়বাবু?” অক্ষয় অত্যন্ত নার্ভাস হইয়া দুই হাত রগ্‌ড়াইতেছিলেন। কমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল, “আমি কোন পুরুষকেই জীবনে ফিরাব না, বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত প্রেমের আগুন জ্বালাব। এই যে আজ শিবনাথবাবু আমাকে ভাল-বেসেছেন, ওঁর কাছে রয়েছি। কাল যদি ওঁর মন চটে' যায় অথবা আমারই আর ওঁকে না ভাল লাগে, তখন যাকে পছন্দ হবে—সে যেই হোক্, রামহরি, গীয়াসুদ্দিন অথবা আবদুল কাদের তারই সঙ্গে তৎক্ষণাৎ চলে' যাব, একবার ফিরেও তাকাব না! এই ত জীবনের চরম সার্থকতা অক্ষয়বাবু! চিরকাল একটি লোককেই ধরে' পড়ে' থাকাটা মনের জড়ধর্ম্ম,—শোচনীয় মৃত্যু বলে' জানবেন।”

এই বলিয়াই সে মুখ তুলিয়া দেখিল অজিতের চোখে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার অগ্নি তখনি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কমলের বুঝিতে বাকী রহিল না যে একটি নূতন প্রেমের সূর্য্যোদয় তাহার জীবনের পূর্ব্বাকাশ আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। কি জানি সেই চাহনি মনোরমার চোখে পড়িল কি না, কিন্তু সে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, “বাবা আমি যেমন করে' পারি অজিতবাবুকে একবার তাজমহলটা দেখিয়ে আনি।” এই বলিয়া সে এক প্রকার বলপূর্ব্বক অজিতের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। অন্য সময় হইলে সে কখনও এরূপ করিতে পারিত না, কারণ অজিত অসুরের ন্যায় বলশালী। কিন্তু এরূপ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে চিত্তবৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনা হইলে বড় বড় হস্তীও একে-বারে নিরীহ ছাগবৎসতুল্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্বিৎ ফিরিয়া পাইবামাত্র সে মনোরমার হাত ছাড়াইয়া কমলের পাশে আসিয়া

বসিয়া পড়িল। কমল তখন বলিতেছিল, "একদিন আশুবাবু তাঁর স্ত্রীকে ভাল বেসেছিলেন, আজ তিনি বেঁচে নেই, আশুববাবু তাঁর স্মৃতি বুকে করে চিরকালটা উপবাসী থাকুন আর নাই থাকুন—তিনি ত আর দেখতে আস্‌ছেন না। তাঁর স্ত্রীর কি যায় আসে তাতে? মরা গরু ত আর ঘাস খাবে না! কিন্তু মূর্খ হিন্দুরা তা বুঝবে না, যে গরু মরে' গেছে, যার পেট ফুলে ঢাক হয়েছে—হিন্দুরা তারই মুখে ঘাস যোগাবে!" অক্ষয় বলিলেন, "কিন্তু এ ত মরা গরুর ঘাস খাওয়া নয়, এটা হচ্ছে, মানুষ এই রক্ত মাংসের বন্ধন অতিক্রম করেও শ্রেয় বস্তু পেতে পারে—"

কমল গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ও সব অর্থহীন প্রলাপ হিন্দু-ঋষি-গুলোর চূড়ান্ত ভণ্ডামি।"

অক্ষয় অনেকটা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন, একলা মানুষ কতক্ষণ আর যুঝিবেন, ক্ষীণকণ্ঠে মরি বাঁচি করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তাঁরা কি তবে প্রলাপ বকেছিলেন?"

"তা হ'লেও ত বুঝতুম তারা উন্মাদ, শুধু তাই নয়, তারা বদ্‌মায়েস-পাগল—"

হঠাৎ সকলে চমকিয়া উঠিল। অজিত অক্ষয়ের পৃষ্ঠে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছে। সে ক্ষেপিয়া উঠিয়া অক্ষয়কে এরূপ আক্রমণ করিল যে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ছাড়াইতে গিয়া তাহার হস্তে যথেষ্ট প্রহৃত হইলেন। কমল বাধা দিতে গেলে সে দাঁত দিয়া তাহার হাত কামড়াইয়া দিল ও কাপড় চোপড় ছিঁড়িয়া একাকার করিল। তারপর যে যেদিকে পারিলেন দৌড়িলেন। আশুবাবু দৌড়িতে গিয়া পড়িয়া গেলেন এবং শত চেষ্টাতেও আর উঠিতে পারিলেন না। মনোরমা ও কমল দুইজনে দৌড়িতে না পারিয়া শিবনাথের গলা ধরিয়া

ঝুলিয়া পড়িল। শিবনাথ অতি কষ্টে একপ্রকার তাহাদের টানিয় লইয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনজনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে অজিত অক্ষয়কে ছাড়িয়া দিয়া দৌড়িয়া আসিল ও একেবারে কমলেরা পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমায় ফেলে পালিয়ো না শিবু, তোমার জন্তই দুর্বৃত্তটাকে রীতিমত শিক্ষা দিলাম।" এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কমল করুণায় দ্রব হইয়া তাহার ছেঁড়া কাপড়ের আঁচল দিয়া অজিতের চক্ষু মুছিয়া দিতে লাগিল। শিবনাথ সেই ফাঁকে মনোরমাকে লইয়া সরিয়া পড়িলেন। এম্‌নিই হয়! আশুবাবু দূর হইতে সবই লক্ষ্য করিতেছিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, "আশ্চর্য্য!" আশ্চর্য্যই বটে! এ ছাড়া মনের কথা ব্যক্ত করিবার আর শব্দ ছিল কি? বস্তুতঃ উহারা চলিয়া গেল যেন এক অত্যাশ্চর্য্য নাটকের মধ্য-অঙ্কেই যবনিকা টানিয়া দিয়া, পর্দ্দার ওপিঠে না জানি কত বিস্ময়ের ব্যাপারই অগোচরে রহিল।

৫

দিন পনের পরের কথা। অজিত সত্তর মাইল স্পীডে মোটর হাঁকাইয়া চলিয়াছে। আগ্রা সহরের প্রান্তে একটি নির্জ্জন রাস্তা তাহার দুঃসহ যাত্রার বেগে কাঁপিতেছে। এমন সময় পথের পাশে নারীকণ্ঠে সে শুনিল, "ও অজিতবাবু গাড়ী রুখুন—আমি আমি।" ব্রেক কষিয়া অজিত দেখিল একটি পোড়ো বাড়ীর সম্মুখে কমল দাঁড়াইয়া আছে। অজিত কহিল, "কি আশ্চর্য্য, মেঘ না চাইতেই জল, এই বুঝি আপনার বাড়ী?"

"হাঁ, এই একটেরে-জায়গায় একলা থাকি—মুচিপাড়ার মধ্যে! সর্ব্বদাই মনে হয় জীবনটা যেন একটি জুতোর কারখানা"—এই বলিয়া সে নিজেই গাড়ীর দরজা খুলিয়া অজিতের পাশে আসিয়া বসিয়া বলিল, "এইবার চালান দেখি, কত জোরে চালাবেন। আমারও মোটর চড়বার বড় সখ, কিন্তু এমন মানুষটির কাছে আছি যে মোটর ত দূরের কথা, গরুর গাড়ী চড়বারও পয়সা নেই।" অজিত আর বাক্যব্যয় না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মোটর ছুটাইল। রাস্তায় দুই চারিটি মুর্গী, দুই পাঁচটি ছাগল ভেড়া চাপা পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, 'ভ্যা' করিবার অবসরটি পাইল না। কমল বলিতেছিল, "এইত চাই, একেই বলে পথ চলা! তা না হ'লে আস্তে আস্তে বেতো রুগীর মত পথ চল্‌তে দেখ্‌লে আমার পিত্তিটা জ্বলে যায়—যেন সাড়া নেই, মড়ার মতন! সে সব লোক মনে করে পথটাকেই ফাঁকি দিলাম, কিন্তু ফাঁকে যে নিজেরাই পড়ছেন, তার ঠিকানা নেই, কেমন ঠিক না অজিত বাবু!"

'এর মানে?"

কমল একটু দুর্ব্বোধ্য হাসি হাসিয়া বলিল, "মানে নেই, এমনি।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি বাড়িয়া চলিল। তথাপি কেবলই অজিতের পিঠে চিম্‌টি কাটিয়া কাটিয়া কমল তাহাকে দূর হইতে দূরান্তরে লইয়া চলিল। হঠাৎ এক সময় এই রহস্যময়ী নারী না জানি কি ভাবিয়া, বোধ করি কৌতূহলবশেই হইবে, অজিতের উভয় চক্ষু টিপিয়া ধরিতেই তাহার গাড়ী মাঠে লাফাইয়া পড়িল এবং একটি অশ্বত্থবৃক্ষে ধাক্কা লাগিয়া গাড়ীটি উল্টিয়া গেল। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ! অজিত ও কমল উল্টান মোটরের ভিতর হইতে অক্ষত দেহে বাহিরে আসিল। তাহারা মাঠের পথ দিয়া এক হাঁটু ধূলার বাধা অতিক্রম করিতে করিতে (ওদিকের পথগুলোয় বড্ড ধূলা হয়) দুইজনে

আবার সেই পোড়ো বাড়ীটির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মোটরটা উল্টান অবস্থায় মাঠেই পড়িয়া রহিল, অজিত কেবলমাত্র আসিবার সময় বুদ্ধি করিয়া উহার ভিতর হইতে একটি হাতলণ্ঠন যোগাড় করিয়া আনিয়াছিল। বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া কহিল—"দাঁড়ান হাতলণ্ঠনটা আগে জ্বালি, অন্ধকারে এই পোড়ো ঘরে যে সাপের ঘাড়ে পা দেব সেটি হচ্ছে না।" কমল অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল 'হাঁ'। কিন্তু নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "কি আনন্দই না আজকে পেলাম, মরবার সময়েও এই সুখের টুক্‌রাটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখব। কোনদিন যদি হোঁচোট লেগে পায়ের আঙুল থেঁতলে যায় তখন এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিতে পারব যে—না আমার পা মচকায় নি, আর যদিই বা মচকে থাকে, কি যায় আসে তাতে? মোটর চড়ে, আজ যে সুখ পেলাম সেটা বড় না পায়ের ব্যথাটা বড়?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর পুনরায় বলিল, "এই মোটর ছুটিয়ে মুর্গী চাপা দেওয়ার আনন্দ অথবা মোটর উল্‌টে চিৎ হ'য়ে পড়া—এ দুইএর কোনটাই সত্য নয় অজিতবাবু, সত্য শুধু এই যে আজ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটেছিলাম দু'জনে, ছাগল ভেড়া মানি নি, গরু মোষও মান্‌তাম না, চলার আবেগে সব টপ্‌কে যেতাম, এই আবেগের জন্যই সুইফ্‌ট বোধ করি তাঁর নভেলে ঘোড়াকে মানুষের প্রভু করেছেন, বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে এই সত্যটিকে পাওয়াই ত সত্যিকার পাওয়া, ঠিক নয় অজিত বাবু?"

অজিত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কমলের মুখ দেখিতে পাইবার জন্য শুধু শুধু কতগুলি দেশলাই কাঠি যে সে পোড়াইল তাহার ইয়ত্তা নাই—লণ্ঠনটা জালিবার কথা মনেই হইল না।

কিন্তু মনে হইল অন্ধকারেও অপরের চক্ষু তাহার নিকট একটা নিশ্চিত জবাব চায়। অগত্যা সে বলিল—"হাঁ আমারও এই মত।" একটা চাপা নিশ্বাস পড়িল। অজিত আর একটি দেশলাই কাঠি জ্বালিয়া দেখিল—কমল চক্ষু দুটি অর্দ্ধস্তিমিত করিয়া মিট্ মিট্ করিয়া চাহিতেছে। তদবস্থায় বলিল, এই সত্যটি আজ না বুঝলেও আপনি বুঝবেন একদিন, আর সেইদিন আমাকে মনে করবেন, চাই কি চলেই আসবেন—আসবেন ত?"

"হুঁ।"

কিছুক্ষণ পরে উভয়ে ঘরে আসিয়া বসিল। কমল ষ্টোভটা জ্বালিয়া তাহাতে কি একটা চড়াইয়া দিয়া একখানি আসন আনিয়া পাতিয়া দিল, অজিতকে বলিল—"এইটিতে উঠে বসুন।"

"কেন?"

"লোকে কথায় বলে যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই। সখ করে' আসন খানা কিনে সেদিনের লোকটিকে বসতে দেব ভেবে-ছিলাম, আজ তাতে কে এসে বসল দেখুন! অথচ কতটুকুই বা সময় কেটেছে ইতিমধ্যে! এম্‌নিই হয়!"

"কিন্তু ষ্টোভ জ্বালালেন কেন এত রাত্রে!"

"আপনার জন্যে এক পেয়ালা চা তৈরী করছি, চায়ে চিনি বেশী দেব কি? আমি ত দুধ আর মিষ্টির লোভেই চা খাই। আচার্য্য রায়ের 'শরৎ-সাহিত্যে চা' প্রবন্ধটা পড়বার পর থেকে চায়ের নেশাটা ত্যাগ করে' ওর মিষ্টত্ব আর দুধত্ব টুকুই হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি।"

ইহার অর্থ যে কি তাহা ভাবিয়া পাওয়া দায়! হয়ত অতীব সহজ হয়ত ততোধিক দুরূহ, হয়ত বা এ দুইএর কোনটাই নয়। কি অজিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল "কি

কই রান্নার যোগাড় ত আর কিছু দেখছিনে, আপনিই বা খাবেন কি আর শিবনাথবাবুই বা খাবেন কি?”

“আমার কথা ছেড়ে দিন, দিনের মধ্যে ঐ একটিবার খাওয়া, বাস্ আর ম’রে গেলেও না। রিপুগুলোর মধ্যে একটাকে যেমন যথেচ্ছ ক্রিয়ার অবসর দিয়েছি, অপর গুলোকে তেমনি দমিয়ে রাখতে হয়েছে। তা না হ’লে balance of yearning কম বেশী হ’য়ে পড়ে। স্বভাবের মাত্রাটা ঠিক থাকা চাই, মোট-কাজটা যেন মাপসই হয়। কিন্তু তাতেও বোধ করি আপনি নাছোড়বান্দা হ’য়ে জিজ্ঞাসা ক’রবেন—‘তা যেন হ’ল, শিবনাথবাবুর কি হবে, তিনি ত আর স্বভাবের মাত্রা মেনে চল্‌ছেন না’—আমি তখন অগত্যা বল্‌ব যে তিনি অনেক দিন হল পালিয়েছেন, শিব্যানির প্রেম শিবত্ব লাভ করেছে। কিন্তু এটা খুব স্বাভাবিক অজিতবাবু, এরকমটা না হ’লেই বরং মনে করতাম তাঁর মনটা মরে গেছে। ভালবাসাটা ত আর বটগাছের শিকড় নয়,—সেটা বরং মাকড়সার জাল—ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে। না যদি ওড়ে তবে বুঝব, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর সেটা নয়, মড়ার কবরই হয়েছে।”

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল, “আমারও মনটা মরে যায় নি অজিতবাবু, আমিও শুয়ে শুয়ে শিবনাথের কথা ভাব্‌ব আর কড়িকাঠ গুণব—তা হবে না। পূবদিকের জানালা বন্ধ করে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকব না,—আমি তাদের একজন নয়—যারা প্রত্যহ মনে করে এইবার বুঝি পশ্চিম দিকেই সূর্য্য উঠবে আর পূবদিকে অস্ত যাবে!” এই বলিয়া সে অজিতের দিকে আড়চোখে চাহিয়া একবার হাসিল। অজিত লণ্ঠনের আলোকে দেখিল—এ হাসির জাতই আলাদা।

৬

অজিত যখন ঘরে ফিরিল তখন রাত্রি প্রায় দুইটা হইবে। সে ভাবিতেছিল, না জানি বাড়ী পৌঁছিয়া আশুবাবু ও তদীয় কন্যার কতই না ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি শুনিতে হইবে, মনে মনে সে তাই কতকগুলি মিথ্যা ও আজগুবি অজুহাত বানাইয়া রাখিতেছিল। কিছুক্ষণ হইল চাঁদ উঠিয়াছে, কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ, তাহার আলোকে পথ ঘাট একপ্রকার অস্পষ্ট দেখা গেলেও অজিত মনে মনে একটু ভয় পাইতেছিল। চতুর্দ্দিক স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, তার উপর অজিতের ভূতের ভয়ও যথেষ্ট ছিল। এইরূপ অবস্থায় ঘরে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় বাড়ীর পাশে একটা ঝোপের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ আওয়াজ শুনিয়া সে উঁকি মারিতেই অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইল শিবনাথ মাটির উপর কনুইএ ভর দিয়া শুইয়া আছেন, আর মনোরমা ঠিক তাহারই উপরে কিছু উঁচুতে একটি গাছের ডালে বসিয়া আছে। তাহাদের দেখিয়া অজিত কথঞ্চিৎ ভরসা পাইল এবং কি কথাবার্ত্তা হইতেছে আগ্রহভরে শুনিতে লাগিল। সেদিন অক্ষয়ের সহিত ঝোঁকের মাথায় শিবনাথকেও সে দুই চার ঘা মারিয়াছিল বটে, কিন্তু মনে মনে শিবনাথের প্রতিভার উপর তাহার একটি আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাব ছিল। এক্ষেত্রে মনে করিল শিবনাথ যাহাই বলিতে থাকুন না কেন তাহার মধ্যে কিছু না কিছু জ্ঞানলাভের আশা আছে, বিদ্যা চুরি করায় ত আর পাপ নাই, অন্ততঃ সেটা উচ্চাঙ্গের চুরি। শিবনাথ ও মনোরমার মধ্যে আলোচনা হইতেছিল একটি নূতন রাগিণী লইয়া। এটি শিবনাথের সৃষ্টি, কোন সঙ্গীতকার এপর্য্যন্ত এই রাগটির মর্ম্ম বুঝিতে

পারেন নাই। রাগটির নামকরণ এখনও অবশ্য হয় নাই তবে শিবনাথের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে এই একটি রাগেই সঙ্গীতজগতে একটি যুগ পরিবর্ত্তন ঘটাইবে, তাহার পশ্চিমের জানালা বন্ধ করিয়া পূর্ব্বদিকের জানালা খুলিয়া দিবে। রাগটির জন্মবৃত্তান্ত একটি আশ্চর্য্য ব্যাপাব। সেদিন বাজার হইতে তিনি একটি ইলিশ মৎস্য ক্রয় করিয়া ফিরিতেছিলেন, চালানি মৎস্য, প্রায় পচিয়া গিয়াছে। কাজেই কড়া করিয়া ভাজা দরকার বিবেচনা করিয়া খাঁটি সরিষার তৈল সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে তেলীর বাড়ী প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ঢুকিবা-মাত্র তেলীর কৃষ্ণকায় যুবতী কন্যাটিকে দেখিয়াই উপরোক্ত সুরটি চাবুকের ন্যায় সপাৎ করিয়া মগজের মধ্যে খেলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই সুরে একটি গান বাঁধিলেন।

তাহা এই :—

তেল-সাগরের লক্ষ্মী ওলো
  সরষে ফুলের মক্ষিটি!
তোর বসনের গন্ধে আমার
  আকুল পরাণ-পক্ষীটি।
তোর চিকণ কালো কেশের শোভায়
  কৃষ্ণতর রূপের প্রভায়—
চিত্ত-হুঁকায় জ্বল্‌ছে দ্বিগুণ
  প্রেম-চরশের কল্‌কেটি।
ওলো মুচ্‌কি হেসেই খুল্‌লি কি তুই
  মন-ভবনের খিড়্‌কিটী!
 ও পথ দিয়ে ঢুকব কি?
 সেই ইসারা করছ কি!

কিন্তু এ ভয়, ঘুরাও পাছে
প্রাণ-বলদে লাগিয়ে তোমার
প্রেমের ঘানির চর্‌কিটি !
বেশ ঘুরাও, তাতে নেইক ক্ষতি
যতই খুসী ক্ষিপ্র-গতি,
তোমার ঠ্যালায় ঘুরবে সে আজ—
পরাণে তার স্ফূর্তি কি !
প্রেম-নিকুঞ্জে তুই যে আমার
শেষ পহরের মুর্গীটি।

শিবনাথ সুর করিয়া গানটি গাহিতেছিলেন। অন্তরার শেষ লাইনে "মুর্গীটি"র উপর সম। সমের কাছে আসিয়া শিবনাথ এমন একটি বিচিত্র অনুভূতি জাগাইলেন যে "মুর্গী" কথাটি উচ্চারণ করিবামাত্র মনোরোমা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া বৃক্ষশাখা হইতে একেবারে শিবনাথের গায়ের উপর পড়িয়া গেল। তাহার একটি পা শিবনাথের ঠিক পেটের উপর পড়িতেই—তাঁহার নাভিস্থল হইতে "কোঁক্" করিয়া একটি আওয়াজ বাহির হইয়া আসিল। তিনি কাত হইয়া পড়িলেন। মনোরমাও টাল সামলাইতে পারিল না, বস্তুতঃই সে পড়িয়া গেল। অজিত বাহির হইতে সবই লক্ষ্য করিতেছিল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "accident, accident, আলো চাই, আলো চাই।" চাকর দরোয়ান যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল, আশুবাবু উপরের বারান্দা হইতে উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন,—"বোধ করি কাউকে সাপে কেটেছে আর কি ! আঃ কি সাপের উপদ্রব বাবা, আর পারা যায় না।"

চেঁচামেচিতে তাঁহার আফিংএর নেশাটা কাটিয়া যাওয়ায় তিনি সত্যই বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি দেখিলেন

মূর্চ্ছিতপ্রায় মনোরমাকে অজিত ও শিবনাথ উভয়ে বহন করিয়া আনিতেছে, অজিত ইসারায় আশুবাবুকে বুঝাইয়া দিল, "ও কিছু নয়, সামান্য accident মাত্র।" মনোরমাকে ঘরে শোয়াইয়া দিয়া শিবনাথ বিদায় লইলেন, তিনি চলিয়া যাইবার পরেও অনেকক্ষণ শূন্য দরজার দিকে চাহিয়া থাকিয়া আশুবাবু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন— "পলাতক গুণী শিবনাথ!"

অজিতও মনোরমার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল—. এমন সময় মনোরমা বলিয়া উঠিল—"এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ইয়ার্কি মারা হচ্ছিল শুনি?"

অজিত বলিল, "চুপ্ চুপ্, বেশী কথা ক'য়োনা, আবার মাথা ঘুরবে।"

"এরকম করে' সকলে তোমার জন্যে হায়রান হবে নাকি—একেবারে নবাবপুত্র হ'য়ে উঠেছ দেখছি! কি অধিকার তোমার এই রকম সকলকে কষ্ট দেবার!" বলিতে বলিতে কান্নায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অজিত দোষ স্বীকার করিয়া বলিল, "অধিকার বল্‌তে ত এক তুমিই, আর কার জোরে এত রাত বাইরে থাকব বল!"

"বটে, বিয়ে হতে না হ'তেই এই! বিয়ে হ'লে ত এতক্ষণে আমার গলায় ছুরি লাগাতে দেখছি! Brainless idiot কোথাকার।" সত্যই তাহার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, সে পিছন ফিরিয়া শুইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অজিত কিছুক্ষণ সেখানে অপরাধী দস্যুর মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

পরের দিন সন্ধ্যায় আশুবাবুর বাড়ী গানবাজনা তেমন জমিল না। সবাই যেন কালাজ্বরে ভুগিয়া উঠিয়াছেন—ভাবটা এইরূপ। মনোরমা একাই সকলকে উৎসাহ দিতেছে, কিন্তু তাহাতে বড় বেশী ফল হইতেছে না। মনোরমা তখন শিবনাথকে "কালকের সেই গানটা একবার গাওনা গা" বলিয়া অনুরোধ করিল। শিবনাথ "তেল সাগরের লক্ষ্মী ওলো" গানটা ধরিতে সকলের নেশা কতকটা কাটিল। অবিনাশ ও হরেন্দ্র একটি বেঞ্চে বসিয়া পরস্পরের কাঁধে হাত রাখিয়া ঢুলিতে-ছিলেন, এতক্ষণে চোখ রগড়াইতে লাগিলেন। আশুবাবুর বেশ নাক ডাকিতেছিল, তিনি একটি ঈজি চেয়ারে হাত-পা মেলিয়া পড়িয়া ছিলেন। নিদ্রাজড়িত স্বরে বলিলেন—"ব্রেভো, মধুরেণ সমাপয়েৎ।"

এদিকে অজিত কমলের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। কমল তাহাকে গত দিনের সেই আসনখানি পাতিয়া বসিতে দিল। অজিত বসিতেই কমল বলিল, "আজ প্রচুর আয়োজন করেছি আপনার জন্য।"

"কি রকম ?"

"মাছ, মাংস, গলদা চিংড়ী, বড় কাঁকড়া—সাধারণতঃ এসব যা হয় তা ত আছেই, তাছাড়া আরো আছে। কিন্তু সেই সাতসকালে রেঁধে রেখেছি, এতক্ষণ বোধ করি সব জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল। আর একটু দেরী হ'লেই কোন শালী না সব কুকুরকে ডেকে খাওয়াত, মাইরী বলছি।"

"সে ত বেশ হত।"

"বেশ হ'ত! বল্‌তে পার্‌লেন এ কথা! পুণ্যাত্মা হিন্দুরা তাই বল্‌বে বটে, কিন্তু মূর্খরা বোঝে না যে কুকুরকে খাওয়ালে পরকালের কাজ হ'তে পারে বটে, ইহকালের কিছুই হয় না। দু'টো খাও, দু'টো ফেলে দাও, দু'টো ছড়িয়ে দাও, কিন্তু নিজের ভালবাসার লোকেই যা ইচ্ছে হয় করুক, তা বলে' অপরকে দেব নাকি? এই খামাখা ফেলাছড়ার মধ্যে যে কত সুখ—তা ওরা কি বুঝবে?"

অজিত রহস্য করিয়া বলিল, "কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে কুকুরকে গল্‌দা চিংড়ী খাওয়ালে অক্ষয় স্বর্গবাস হবে!"

কমল জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "ঝাঁটা মারি অমন স্বর্গে! এই যে শিবনাথের আসনে আপনাকে বসিয়ে গল্পগুজব করছি, লাউএর ঘণ্ট খাওয়াচ্ছি, এতে ব'ল্‌বে অনেক লোক যে অন্যায় হচ্ছে, শিবনাথের আশায় পশ্চিম দিকের জানালা খুলে বসে' থাকাই ঠিক, কিন্তু তাহ'লে হবে এই যে রোজই সূর্য্য ডুব্‌ছে, উঠছে না কখনো, শুধু এমনিই মনে হবে।" তারপর ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিল,—"তাতে লোকের বাহবা হয়ত পেতে পার্‌ব; কিন্তু পেট ভরবে না কখনো। বুকটা খালি হ'য়ে উঠবে, মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, হাত-পা অবশ হ'য়ে যাবে। শেষে হয়ত ভাবতে থাকব বোধ করি সূর্য্য ডুবছেই না—নীচের দিকে নেমে গেলেও বস্তুতঃ ও উপরের দিকেই উঠছে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুনরায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপর নিম্নস্বরে কহিল, "এ কথার গুরুতর অর্থ যদি কোন দিন বুঝতে পারো সোজা চলে' এসো আমার কাছে, দ্বিধা করো না।"—এই বলিয়া সে বহুবিধ ভোজ্যপেয় অজিতের দিকে আগাইয়া দিল। অজিত আহারে প্রবৃত্ত হইয়া কহিল, "আচ্ছা যদি আমারই মত আর একজন আর

একদিন এসে এই আসনটিতে বসে—তাকেও এমনি কথা বলে' এমন করে' খাওয়াবে ?"

"নিশ্চয়। প্রত্যাখ্যান করাটা জড়ের ধর্ম্ম। আমার বাবা গোসাপের বুকটা ভেজে খেতেন, আর গিরগিটির পা-গুলো অল্প অল্প সেঁকে নিয়ে সরষের সঙ্গে মাখিয়ে খেতেন, ওতে শরীর ও মন দুইই অত্যন্ত তাজা থাকে—তিনি প্রায়ই একথা বল্‌তেন। আমিও ছেলেবেলা অনেক খেয়েছি, তাইত মনের জড়ধর্ম্মটাকে কাটাতে পেরেছি।"

এই বলিয়া সে চাট্‌নির পাত্রটা অজিতের দিকে ঠেলিয়া দিল। এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে অজিতের মনোরঞ্জন করিবার জন্য কমল দুই এক প্রকার সাঁওতালী খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার এবম্প্রকার রুচির কারণ তাহার মুখেই ব্যক্ত হইবে। যাহাই হউক বিলাতে অজিত ব্যাঙের চপ প্রভৃতি অনেক নূতন প্রকারের খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিল, কাজেই এক্ষেত্রে সে আদৌ আশ্চর্য্য বোধ করিল না। অধিকন্তু অনুভব করিল, তাছাড়া অনুভব করিতেই বা হইবে কেন—পূর্ব্ব হইতেই তাহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে খাওয়ার ব্যাপারটি ফ্যাশন ব্যতীত কিছুই নয়। সাঁওতালী, তিব্বতী যে খাদ্যই হউক, বেশ চলিয়া যাইবে এবং ভোক্তারা তাহা বেশ উপভোগ করিবে, কেবল মাত্র যদি সকলে বুঝিতে পারে যে এই সর্ব্বপ্রথম এই বস্তুটি তাহাদের পাতে পড়িল। এখানেও তাই সে রুচিপ্রবর্ত্তক হিসাবে কমলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু সে একাই খাইতেছে, কমল মুখটি শুকনা করিয়া বসিয়া আছে, ইহা সে দেখিতে না পারিয়া বলিল, "কই আপনি খাবেন না ? আসুন না এই এক সঙ্গেই বসা যাক্।"

"তাতে ত আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমি প্রথম স্বামী মরবার পর থেকে যে মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছি। যদিও শিবনাথবাবু জোর করে' দু'একটা ডিমের টুক্‌রা খাইয়ে দিয়েছেন কখনো কখনো—আমি সেটা তেমন পছন্দ করতাম না।"

"তবে নিরমিষ্যি তরকারিগুলো খান, এতে ত আর আপত্তি থাকৃতে পারে না"

"আচ্ছা-লোকের পাল্লায় পড়েছি যাই হোক, লোকে কথায় বলে—মিড়মিড়ে প্রদীপ আর জিড়জিড়ে পুরুষ।" এই বলিয়া কমল একটু দুর্ব্বোধ্য হাসি হাসিয়া ঘরের কোণ হইতে সরা-চাপা পান্তাভাত লইয়া আসিল, গোটা দুই কাঁচা পেঁয়াজ গোটা কতক কাঁচা লঙ্কাও যোগাড় করিয়া আনিল! আহারে প্রবৃত্ত হইয়া সে মাঝে মাঝে অজিতের পাত হইতে নিরামিষ তরকারির একটু আধটু তুলিয়া লইয়া চাখিতে লাগিল। গভীর বিস্ময়ে অজিত বলিল, "যথার্থই তুমি দেবী, যারা অকারণে তোমার গ্লানি করে' বেড়ায় তারা তোমার পাদস্পর্শের যোগ্য নয়।" কমল আবার একটূ মুচকি হাসিয়া—সেই প্রকার দুর্ব্বোধ্য হাসি—উপরের দিকে হাঁ কবিয়া জলের ঘটি হইতে আলগোছে পুরা একটি ঘটী জল মুখে ঢালিয়া দিল। বলিল "উঃ লঙ্কাটা এত ঝাল যে পেট পর্য্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে।"

অজিত কোন কথা বলিল না, বলিবার ছিলই বা কি? কিন্তু তাহার চোখের নীরব কাতরতায় কমলের বুকে ব্যথা বাজিল। ক্ষণকাল কি চিন্তা কবিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না, বিধবার আচারটাও পালন করা হয় অথচ তোমারও মান রাখব।" এই বলিয়া সে অজিতের পাত্র হইতে শুধু মাংসের একটুখানি ছাল ছিঁড়িয়া লইয়া মুখে দিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা চুষিয়া ফেলিয়া দিল।

অজিত আর সহিতে পারিল না, সে উচ্ছিষ্ট হাতেই উপবিষ্ট কমলের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ওঃ এত ত্যাগ, এত আত্ম-পীড়ন, তুমি মানুষ নও, তুমি ঈশ্বরী !"

কমল পুনরায় সেইরূপ হাসিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দিয়া অজিতের নাকে একটি টোকা মারিল। বলা বাহুল্য লঙ্কার ঝালে অজিতের নাসিকা বিষম জ্বলিতে লাগিল—ফলে সে কমলের পা ছাড়িয়া দিল।

তার পর উভয়ে হাত মুখ ধুইয়া তক্তাপোষে আসিয়া বসিল। কমল ইতিমধ্যে অজিতকে এক কলিকা তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। পানের বাটা বাহির করিয়া বলিল, "যেজন্য আজ তোমাকে ডেকেছি সে কথা এখনো বলা হয় নি—আমার সব কথা আজ তোমাকে বলব।"

"কি কথা ?"

"তাই ত বলছি। সুপারি কুচাইতে প্রবৃত্ত হইয়া সে সুরু করিল—" 'আমার মা ছিলেন জাতে সাঁওতাল। তাঁর উপর আসামের চা-বাগানের বড় সাহেবের নজর প'ড়লে আমার জন্ম হয়। চা-বাগানেই সাঁওতাল-দের মধ্যে আমি মানুষ হ'য়েছি, তবে আমার জন্মদাতা বড় সাহেব আমাকে বড্ড ভাল বাস্‌তেন। তাঁর চেহারটা ছিল অত্যন্ত বদ্। সিডনীতে একটি কারখানায় কুলিদের সঙ্গে কবে কি গোলমাল করেছিলেন,—তারা তাঁর একটা পা খোঁড়া করে দিয়েছিল। তাছাড়া সেই খোঁড়া পা নিয়েই রাত্রে রাত্রে মিলহ্যাণ্ডদের কোয়ার্টার্সে ঘোরার অভ্যাস ছিল, সেই নিয়ে কতবার যে মরুতে মরুতে বেঁচে গেছেন তার ঠিকানা নেই। তাঁর চোখ দুটো ছিল অত্যন্ত ছোট, নাকটি তেমনিই বড়—আমার নাকটাও তাই কতকটা লম্বা হয়েছে, ভ্রূতে চুল ছিল না একেবারে, তার উপর কপালে একটি খরগোস উল্কিতে আঁকা, মাথার বিরল কেশগুলি সর্ব্বদাই উপরের দিকে খোঁচা হ'য়ে থাকত। কত

আর এমনি ব'লব। যাই হোক মার পছন্দটার উপর যদিও আমি চটে ছিলাম, জ্ঞান হ'তে দেখলাম লোকটা নেহাত মন্দ নয়। বড় মায়ার শরীর। আমাকে প্রায়ই বাইবেল পড়ে' শোনাতেন, আর হিন্দুসমাজের যত পচা গলদের কথা বলতেন। মুখে মুখেই এত শিখিয়েছিলেন যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তা শেখা যায় না। একদিকে এস্‌কাইলাস থেকে চসার, ওদিকে কন্‌ফুসিয়াস থেকে দালাইলামার দার্শনিক তত্ত্বগুলির মীমাংসা, নিউজীল্যাণ্ডের আমদানি-রপ্তানি সবই শিখিয়ে গেছেন।"

কমল এতক্ষণ আপন মনেই বলিয়া যাইতেছিল, অজিতের ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই, করিলে বোধ করি থামিয়া যাইত। উত্তরের অপেক্ষায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল অজিত মুখ কালীবর্ণ করিয়া বসিয়া আছে। কমল সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল ?"

"তবে তুমি জাতে সাঁওতাল ! একথা আগে ব'ল্‌লে না কেন ? মিছামিছি আমার জাতটা মার্‌লে !"

"একথার জবাব আজ দেব না, কারণ তুমি বুঝ্‌বে না।"

"আর পাঁশ বুঝব ! বেনারসে শুধু শুধু বামুন ব্যাটাদের এক রাশ টাকা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লাম। যাই আবার একটা ব্যবস্থা করিগে, হরিহে তোমার মনে এই ছিল !"

অজিত আর বাক্যব্যয় না করিয়া উঠিয়া গেল। হুঁকাটা অসাবধান মুহূর্তে তাহার হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। কলিকার ছাইগুলা মেঝের উপর ছড়াছড়ি হইয়া রহিল। কমল সে সব ঝাঁটাইল না,—ঝাঁটাইতে প্রবৃত্তি হইল না। আর একটা পান সাজিয়া মুখে পুরিল, তারপর দরজায় হুড়কা লাগাইয়া শুইয়া পড়িল। তাহার গালের পান গালেই রহিল, বিছানায় পড়ামাত্র অসাড় হইয়া পড়িল। সারা রাত্রি

পাশ ফিরিল কিনা সন্দেহ, হয়ত ফিরিয়াছিল নয়ত ফিরে নাই, না হয় এ দুইএর কোনটাই নয়। অন্তর্যামীও সে কথা বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ, মানুষ ত পশু মাত্র।

৮

বেলা তৃতীয় প্রহর। শীতের কামড়ে লোক ব্যতিব্যস্ত। আশুবাবু তাঁহার ঘরে আরাম চেয়ারটায় কাত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, নদীর চরের উপর একটা ভাঙা জাহাজের ন্যায়। এমন সময়ে কে তাঁহার পায়ে চিমটী কাটিতেই তিনি উঃ করিয়া উঠিলেন; কিন্তু নড়িতে পারিলেন না। মনে করিলেন বেয়ারা হইবে, বলিলেন, "শালার ছেলে ইয়ার্কি মারবার জায়গা পাও না, উঠি একবার, জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব।" তাঁহার পশ্চাৎ দিক হইতে কে নারীকণ্ঠে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আশুবাবু আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "কে ও শিবু কতক্ষণ এসেছ ভাই?"

"এই ত আস্‌ছি।"

"অনেকদিন দেখিনি যে?"

"মাইরি বল্‌চি, আমার তেমন মনে ছিল না, তা না হ'লে আর কোন কারণ নেই। এখানে আসা যাওয়া কর্‌লে পাঁচজনে পাঁচ কথা কানাঘুসা করতে ছাড়বে না, কিন্তু সেজন্য নয়, লোকের সুনাম দুর্নামটা সেই গল্পের গাধার ছায়ার মতন, মানুষ তাই নিয়ে মত্ত থাকে, এদিকে গাধাটা যায় পালিয়ে। আমার কিন্তু গাধার কায়াটার উপরেই লোভ বেশী।"

অক্ষয়ের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—"এগুলো শুধু বদ্‌মায়েসী নয়? আমাকেই আক্রমণ ক'রে এসব লেখা, নচেৎ সতীত্বের কথা উঠে কেন?"

অক্ষয় ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "না, না, আপনি ছাড়া কি পৃথিবীতে আলোচ্য বস্তু নেই?—আমি শুধু, যারা না প'ড়ে পণ্ডিত তাদেরই—"

"ও একই কথা। হিন্দুসমাজের যত পচা গলদগুলি ভাল বলে' চালিয়ে দেবার চেষ্টা আর সেই সঙ্গে আমাকেও গালাগাল দেওয়া!"

"কি ফ্যাসাদ! আপনাকে গাল দিয়ে আমার কি লাভ হবে! আর হিন্দু সমাজের গলদ নেই একথা ত আমি বলিনি মোটেই। শুধু বলেছি যে সমাজের ত্রুটীগুলি ধর্ম্মের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে কাজটা অনেকটা সহজ হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু তাতে বুদ্ধিমত্তা বা চিন্তাশীলতা প্রকাশ পায় না। সকল মহৎ সংস্কারের বীজ যে হিন্দুধর্ম্মের মূল কথাগুলির মধ্যেই নিহিত আছে, এই কথাটি বুঝতে হলে জ্ঞান ও অনুভব দুইটিই একটু গভীর হওয়া দরকার।"

"ঠিক হিন্দুঋষির বংশধরের মত কথা বটে। কিন্তু উক্ত-প্রকার জ্ঞানলাভের বিশেষত্বটা কি আপনারাই একচেটে করে' রেখেছেন?"

"না, তা কখনই নয়। ওটা মনুষ্যত্বেরই বিশেষত্ব, সে কথা হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দর্শন বলে' গেছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে মাপ করে' দেয় নি, বলেছে তার রূপ অনন্ত, মানুষ প্রত্যেক যুগেই সাধনা দ্বারা তাকে নিজস্বরূপে লাভ করবে। বিলাতের লেখকদের ওঁছা জিনিষগুলি ধার করে' আওড়ালে সেই জ্ঞানলাভ হবে না—সত্য-চিন্তা ও সত্য-কর্ম্মের অনুরাগ—"

কমল বাধা দিয়া বলিল, "ধার করাটা দোষের নয়। হজম করতে

না পারলেই যত গণ্ডগোল, তখন আকৃতিতে মিললেও প্রকৃতিতে থাকে ফাঁক। একবার জারিয়ে নিতে পারলে তখন আর ধরবে কে?"

অজিত আর অক্ষয়কে কোন কথা বলিতে দিল না। বলিল, "অক্ষয়দা বোঝাচ্ছ কাকে? সাঁওতাল যদি বেদান্ত বুঝত তবে বাদুড়ও টিয়াপাখীর ডিম পাড়ত।"

আশুবাবুর পায়ের কাছে একটি মালদহ আমের আঁঠি পড়িয়াছিল। বিকালে আশুবাবু আমটি খাইয়া আঁঠিটি রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভৃত্যকে ফেলিয়া দিতে দেন নাই। প্রায়ই তাঁহার গলাটা শুকাইয়া যাইত, সেজন্য আমের আঁঠি বা একটা যাহা হউক, ইণ্ডিয়া-রবারের টুকরা হইলেও চলিত, তিনি মাঝে মাঝে চুষিয়া রাখিয়া দিতেন। এক্ষেত্রেও তাহাই করিতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কমল সেটি তুলিয়া লইতেই তিনি কমলের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ওটা না, ওটা না—আর একটা কিছু নাও।" কমল বাধা মানিল না। আঁঠিটি সে প্রাণপণ বলে অজিতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। দুর্বিনীতের শাস্তি-বিধান ঠিকই হইয়াছিল, কিন্তু যাহাকে বলে as luck would have it, আঁঠিটি অজিতকে টপকাইয়া অবিনাশের দাঁতে গিয়া লাগিল। ইহার একটু কারণও আছে। অবিনাশের সম্মুখের দাঁত দুইটি অপেক্ষাকৃত বড় ও উচ্চ,—তাহারা বক্রভাবে মাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিম্নের ঠোঁটটি প্রায়ই চাপিয়া রাখিত, আর উপরের ঠোঁটটি প্রসারিত হইয়া প্রায়ই দাঁত দুটিকে চাপা দিবার চেষ্টা করিত। তাহা অবশ্য কিছুতেই সম্ভব হইত না, কিন্তু ঐরূপ চেষ্টা করাটা তাঁর একটি মুদ্রাদোষের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল,—ফলে মুখটা বিকৃত হইয়া যখন-তখন একটি উদ্‌বিড়ালের আকার ধারণ করিত। যাহাই হউক কমল-নিক্ষিপ্ত আঁঠির আঘাতে দন্তদ্বয়ের একটি একেবারে ভাঙিয়া গেল। বস্তুতঃ

…উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার জন্ত আশুবাবুর কোঁচাটি টানিয়া লইয়া চক্ষু মুছিতে……

পৃষ্ঠা ৩৫

ঝাঁটাটি বড় জোরে আসিয়া লাগিয়াছিল। দাঁত দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তিনি একে nervous patient, স্ত্রীবিয়োগের পর হইতেই যে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছিল, তাহা সারে নাই—শ্যালিকার হেপাজেতে বরং উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। মোটের উপর তিনি এ আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "হায় হায় করলে কি, নীলিমার কাছে মুখ দেখাব কি ব'লে? ভাঙা দাঁত দেখলে যে ঝাঁটা মারবে, অমনি ত বিনাদোষে মারবে বলে' ধমক দেয়।"

ঝাঁটার আঘাতে অবিনাশের দাঁত ভাঙিয়া যাইবে এতটা কমল প্রত্যাশা করে নাই। তাহার কান্নায় কমলের নারীহৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। সে উদ্যত অশ্রু গোপন করিবার জন্য আশুবাবুর কোঁচাটি টানিয়া লইয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। কিন্তু টান পড়িয়া আশুবাবুর কোঁচাটি সম্পূর্ণ খুলিয়া যাওয়ায় তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন, একে ত মোটা লোক কাপড় সাম্‌লানোই দায়! উপায়ান্তর না দেখিয়া কমলের দিকে কাত হইয়া তাহার আঁচলখানি টানিয়া তাহারই চোখে চাপিয়া ধরিলেন এবং নিজের কাপড়টি টানিয়া লইলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া অজিত চটিয়া গেল। বিলাতে অবশ্য chivalryর যুগ আর নাই, ট্রামে বাসে স্থানাভাব হইলেও পুরুষরা মেয়েদের জন্য আসন ছাড়িয়া দেয় না শুনা যায়, কিন্তু অজিত মনে মনে মধ্যযুগকেই পূজা করিত; অনেকক্ষেত্রে এরূপ দেখা গিয়াছে। অন্যান্য সকল বিষয়ে অগ্রগামী হইয়াও বায়রনের পোপ-উপাসনার ন্যায় এক একটি লোক পুরাতনের পূজারী। অজিতেরও তাই। সে ভাবিয়া স্থির করিল নারীর অসম্মান সে সহ্য করিবে না, যদি দাঁড়াইয়া এস্থলে তাহাই করিতে হয় তবে তাহার এতদিনের শিক্ষা বৃথা হইয়াছে। আশুবাবুকে

লক্ষ্য করিয়া বলিল, "উনি না হয় নিজের আঁচল ভেবে আপনার কাপড়ের খুঁটটা টেনে নিয়ে চোখের জল মুছেছিলেন, তাতে কতটুকু ক্ষতি হয়েছিল আপনার, আর একটুখানিই ত টেনেছিলেন, কতটুকুই বা! যাই হোক এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব, এরকম bad precedent থেকে যাওয়া ঠিক হবে না।"

এই বলিয়া সে চটাক্ করিয়া টিকিটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। আশুবাবুর দিকে অগ্রসর হইতেই হরেন্দ্র বলিল,—"কর কি অজিত, কর কি?"

"কিছু না, ওঁর চ্যাপটা নাকটি এই টিকির ঘষায় শুধু আর একটু চ্যাপ্টা করে' দেব।"

অবিনাশ দেখিলেন situation out of control, তাড়াতাড়ি হরেন্দ্র ও অজিতের হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল, চল নারীকল্যাণ সমিতির অধিবেশন যে এখনি সুরু হবে, আর ত দেরী করা চলে না।" তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন। পুরুষের দল এইরূপে কমলকে বিদায় সম্ভাষণটি পর্য্যন্ত না করিয়া চলিয়া গেল, অথচ তাদের মধ্যে একজন chivalryর বড়াই করিতে ছাড়িল না দেখিয়া আশুবাবু ধীরে ধীরে কমলের ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া তাহার পিঠ চুলকাইয়া দিতে লাগিলেন, বলিলেন, "দেখ, যদিও তুমি আজ অবিনাশের দাঁত ভেঙেছ, ও উঁচু দাঁত ভেঙে দিয়ে তুমি তার উপকারই করেছ, কিন্তু আমাকে তুমি প্রায় বেইজ্জত ক'রেছিলে আর একটু হ'লে, তবু আমিই তোমাকে সবচেয়ে ভালবেসেছি, আর তুমি বল যে তোমার আস্তে মনে ছিল না।" তাঁহার গলাটা ভারী, চোখের পাতা ভিজে। তাড়াতাড়ি একটি চুরুট ধরাইয়া কমলের মুখের উপর ধোঁয়া ছাড়িয়া দিলেন,— কমল বুঝিল ইহা তাহার নিকট অশ্রু গোপন করিবার জন্যই! সে কোন কথা কহিল না, কহিবার কিছুই বা ছিল! কিন্তু হঠাৎ, বলিতে

পারি না কি ভাবিয়া, সে পূর্ব্বদিকের জানালাটা খুলিয়া পশ্চিমের জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল।

আগ্রার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের স্ত্রী মালিনীর বাড়ীতে নারী-কল্যাণ সমিতির অধিবেশন বসিয়াছিল মাত্র, কিন্তু মহা গোলযোগে তাহা প্রারম্ভেই ভাঙিয়া গেল। অক্ষয় প্রবন্ধটি পড়িতে সুরু করিতেই সকলে ক্ষেপিয়া উঠিল। হরেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভারতীয় নারীর আদর্শ লইয়া কমলের অসাক্ষাতে কোন আলোচনা চলিতে পারে না, সে থাকিলে ইহার রীতিমত জবাব দিতে পারিত। তাহাকেই এ সভায় বাদ দিয়া এ সব কথা বলিতে যাওয়া জোচ্চোরি বই আর কিছুই নয়।"

অক্ষয় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "কেন তা হবে? কমল ছাড়া কি আর চরিত্র নাই জগতে?"

হরেন্দ্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "না, কমল ছাড়া অন্ততঃ আগ্রা সহরে লোক নাই, বাকী সব শূয়ারের পাল।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা, আমরা কোন কথা শুনতে চাই না" যদি কমলকে ডেকে এনে অক্ষয়বাবু তার পায়ে ধরে' মাফ চান, তবেই—"

অক্ষয় বলিতে গেলেন, "না, না, আমি না হয় চুপ করছি আপনারা স্থির হোন,"—কিন্তু কে স্থির হয়! জনতা এতই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখনি তাঁর বাড়ীতে ১৪৪ ধারা জারী করিতে বাধ্য হইলেন। জনকয়েককে তাঁর হুকুমে গ্রেফতার করা হইল, বাকী সকলে লাঠি দ্বারা বিতাড়িত হইলেন।

আশুবাবু হরেন্দ্র অবিনাশ প্রভৃতি সকলে মারের ভয়ে তাড়াতাড়ি একটি গাড়ীতে ঝাঁকাঝাঁকি করিয়া পলাইয়া আসিলেন। সেদিন

কাহার মুখ দেখিয়া আশুবাবুর রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার বাটীর সম্মুখে গাড়ীটি দাঁড়াইতেই সকলে দেখিলেন একজন দীর্ঘাকৃতি কাবুলিওয়ালা দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ী থামিতে সে বলিল, "আশুবাবু কোন্ হায়?"

আশুবাবু সভয়ে বলিলেন, "কেন বাবা, কি চাই!"

কাবুলিওয়ালা কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "এক অউরৎ হম্‌সে দোশো রুপ্পী লিয়া হ্যায়, উস্‌কি নাম কম্মল। উয়ো তুম্‌হারা নাম বাত্‌লা দিয়া হ্যায় যো তুন্‌সে উসকী আস্‌নাই হ্যায়, তুম্ উস্‌কী রুপ্পী দেগা, হম্ মাংতা রুপ্পী দেও, নেহি তো হম্ ছোড়েগা নেহি।"

আশুবাবু কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা অজিত এ বিপদে রক্ষা কর বাবা, না হ'লে ত মারা যাই।"

অজিতের মাথায় উপস্থিত বুদ্ধি খেলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বলিল, "রূপেয়া দেতা, ঠাহ্‌রো।" এই বলিয়া সদলবলে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কাবুলিওয়ালা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সেখানে সোরগোল তুলিয়া দিল, রাস্তা হইতে গালিগালাজ করে, লাঠি দিয়া দরজায় ধাক্কা দেয়, ইত্যাদি নানা প্রকার অত্যাচারে পাড়ার লোককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। এদিকে ঘরের মধ্যে আশুবাবু হরেন্দ্র অজিত প্রভৃতি পরস্পর নিঃশব্দে মুখোমুখি হইয়া করুণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। অজিতের স্মৃতিপথে কমলের সেদিনকার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা স্পষ্ট উদিত হইয়া তাহাকে চিন্তাকুল করিয়া তুলিতেছিল। কেন, সে ত নিজেকে দিব্য সতীর কন্যা সতী বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিত, তাহা ত সে করে নাই, নিজের জন্মকথা, নিজের জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা সবই ত প্রাণ খোলসা করিয়া বলিয়াছিল! আজিও তদ্রূপ এই কাবুলি-

ওয়ালার কাছে আশুবাবুর সহিত তাহার সখ্যের কথা গোপন করে নাই। সত্যই ত! আশুবাবুই বা কিরূপ কমলের অনুরাগী, যদি তিনি কমলকে টাকার দায় হইতে অব্যাহতি দিতে না পারেন! বস্তুতঃ কেন তিনি টাকা দিবেন না? এই অন্যায় সে দাঁড়াইয়া সহ্য করিবে কেন? বিশেষতঃ এইরূপ একজন দুর্দ্দান্ত কাবুলিওলার রোষ স্কন্ধে লইয়া কেনই বা সে আগ্রা সহরের পথে বিপজ্জনক অবস্থায় বিচরণ করিবে! তাহার কি দায়টা পড়িয়াছে? বাক্যব্যয় না করিয়া সে আশুবাবুর কোমর হইতে তাঁহার চাবীর গোছাটি টানিয়া লইল। আশুবাবুর হাঁ না কোন কথা বলিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল, স্থবিরের ন্যায় সেই আরাম চেয়ারটায় চিৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন—কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া; কিছুই ভাবিতে পারিতেছিলেন না, সব ফাঁকা দেখিতেছিলেন। অজিত ক্ষিপ্রহস্তে দেরাজ খুলিয়া দেখিল সর্ব্বসমেত ১২৫টি টাকা আছে। তাড়াতাড়ি নীচে যাইয়া নোটের তাড়াটি কাবুলিওয়ালার হস্তে দিল। সে রাস্তার আলোকে টাকা কয়টি গুণিয়া লইয়া বলিল "পছত্তর রুপী কম্‌তি হ্যায়!"

অজিত তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কসুর মাফ করো, পিছে লে যায়গা—"

"ইমান্‌সে কহ্‌তা?"

"ইমান্‌সে।"

"নেহিতো হম্‌ আশুবাবু আউর কম্মল দোনেকো একসাথ বাঁধকে দরিয়ামে ডাল দেগা।" এই বলিয়া সে দীর্ঘপদক্ষেপে দূরপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। অজিত সেই দিকে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল তাহা কেহ বলিতে পারে না, তাহার মুখের উপর না ফুটিল বেদনার আভাস, না আসিল অভিযোগের ভাষা।

সেদিনকার নারীকল্যাণ সমিতির অধিবেশনে নীলিমাও গিয়াছিল। মারপিট হইবার উপক্রম হইতেই পাশের বাথরুমে লুকাইয়াছিল। এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেটপত্নী মালিনী সেখানে প্রবেশ করিতেই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় জন্মিয়া গেল। ইহা বিচিত্র নহে, বিপদের সময়েই প্রকৃত বন্ধুত্বের সন্ধান মিলে। ফলতঃ উভয়ে স্থির করিলেন যে এই কমল মেয়েটিকে একবার দেখিতে হইবে। নীলিমা ঘরে আসিয়া অবিনাশকে আবদার করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ, কমলকে একদিন নেমন্তন্ন করে' খাওয়াব, আর হরেন ঠাকুরপোকে সঙ্গে করে' আমি নিজে গিয়ে তাকে ডেকে আন্‌ব। মালিনীও আসবেন বলেচেন।"

শুনিয়া অবিনাশ কাঠ হইয়া গেলেন। কমলই তাঁহার দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছে, সভায় হরেন্দ্র তাহার নাম উল্লেখ করিতেই কি বিষম কাণ্ডই না বাধিল, এবারে যে ভাগ্যে কি আছে তাহা বিধাতাই জানেন। কিন্তু অবিনাশ যে নীলিমাকে শুধু ভালবাসা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, যথেষ্ট ভয়ও তাহাকে মনে মনে করিতেন। জোর ত নাই, যদি বলিয়া বসে—এই আমি চললাম, রইল তোমার ঘর কন্না, বাস্ সব ফাঁকা আর কি! কাজেই গত্যন্তর ছিল না—রাজি হইতেই হইল। পরের দিন সকালে হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া নীলিমা তাহার অভিপ্রায় খুলিয়া বলিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কখন যাবে বল সেখানে?"

হরেন্দ্র মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "তা গেলেই হ'ল, কিন্তু—," বলিয়া

সে অবিনাশের দিকে চাহিল। তিনি বারান্দার অপর প্রান্তে একটি পুরনো পাইওনীয়ার মুখে দিয়া পড়িয়া ছিলেন। পারতপক্ষে তিনি ভগ্ন দাঁতটি নীলিমার সম্মুখে বাহির করিতেন না, সে দেখিলেই জ্বলিয়া উঠিত। আর ইহাতে নীলিমারও সুবিধা হইয়াছিল এই যে, কোন বিষয়ে অবিনাশ বেশী আপত্তি করিতে পারিতেন না, সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়াই হয়ত কোন ছলে মুখটি চাপা দিতেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। কিন্তু নিরুত্তর হইয়াই কি পার আছে ছাই! নীলিমা হরেন্দ্রের কুণ্ঠিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কিন্তু কি আবার? ওঁর মতামত জানতে চাও? আমার যাকে ইচ্ছা ডেকে এনে খাওয়াব, ভূতভোজন করাব, উনি বল্‌বার কে? উনি তো আর আমার সাতপাকের বর নন যে ধমকে কথা কইবেন! ওঁর পছন্দ না হয়, তারা যখন আস্‌বে স্বচ্ছন্দে বাথরুমে যেয়ে বসে থাকতে পারেন।"

হরেন্দ্র মাথা নত করিয়া বলিল, "তবে তাই হবে।"

বস্তুতঃ তাহার আর বলিবার ছিলই বা কি?

কিন্তু সেইদিন বৈকালেই হরেন্দ্র আসিয়া জানাইল, নীলিমার আর যাইবার প্রয়োজন নাই। পুরাতন জুতা মেরামত করিবার উদ্দেশ্যে সে মুচিপাড়ায় গিয়াছিল, ফিরিবার পথে কমলের সঙ্গে দেখা। সে একটি প্রকাণ্ড পোর্টম্যাণ্ট' কুলির মাথায় চাপাইয়া তাহার পশ্চাৎ কোথায় যাইতেছিল, বোধ করি কচি ছেলের পুরাতন কাঁথা, বালিশ, লেপ ইত্যাদি বাক্সে বোঝাই করিয়া মুচিপাড়ায় বিক্রয়ের চেষ্টাতেই ঘুরিতেছিল, কারণ এরূপ অনেক মাল তাহার নিকট বহুদিন হইতে জমিয়াছিল। অভাবের সময় ইহারই কিছু কিছু দুঃস্থ পল্লীতে নূতন প্রসূতির গৃহে সস্তাদরে ছাড়িয়া দিত, ইহাতে অর্থও কিছু কিছু সংগ্রহ হইত এবং পুরাতনের স্মৃতির বোঝাও অনেকটা হাল্কা

হইয়া যাইত। তীক্ষ্ণমতি হরেন্দ্র বুঝিল সবই, কিন্তু হিন্দুসমাজের পচা আব্‌হাওয়ায় ও কুসংস্কারের বিষে জর্জ্জরিত তাহার প্রাণ, ঠিক যে কাজটির দ্বারা কমল তাহার অতীত দিনের শুষ্ক-চিহ্নগুলি জীর্ণপত্রের মত ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া অনাগত দিনের বাসর রচনা করিতে চায়, সেই কাজটিই কমলের পক্ষে অভাবের পাদমূলে সুগভীর ব্যথার আত্মদান কল্পনা করিয়া সেও বড় কম ব্যথিত হইল না। একজনের পক্ষে যাহা নাগপাশ ছিন্ন করিতে পারিলেই প্রাণের শান্তি, অপরের কাছে তাহা ফুলের বাঁধন, হইলই বা তাহা বাসি ফুলের মালা! এম্‌নিই হয়। হরেন্দ্রের চক্ষে তাহার মনের কথাটা পড়িয়া লইতে কমলের বিলম্ব হইল না, বলিল, "আশ্চর্য্য হচ্ছেন হরেনবাবু? না, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এইটিই স্বাভাবিক, শোভন ও সুন্দর। যারা পথের কাঁটার মত পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরেছিল তাদের স্মৃতির রক্তকণাগুলো ধুয়ে ফেলাই ঠিক, তবে অশ্রুজলে নয়, চিরমিলনের রক্তিম উষার শিশিরেই তাকে নিঃশেষ ক'রে মুছে দেব। এতে দুঃখিত হবেন না হরেনবাবু! মিলনের এই কামনা আমার জীবনের মর্ম্মমূলে আশ্রয় করেছে, ঐখান থেকেও নিত্যকালের জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগান দেবে, শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হ'য়ে দরজায় পড়ে থাকবে, তাকে স্পর্শও করতে পারবে না। এই ঠিক না হরেনবাবু?"

হরেন্দ্র বলিল, "এর মানে?"

কমল দুর্ব্বোধ্য হাসি হাসিয়া বলিল, "মানে নেই, এম্‌নি।"

হরেন্দ্র আর কোন কথা বলে নাই, অর্থাৎ, হাঁ না কোন কথা বলিবারই ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রণের বিষয়টা উল্লেখ করিয়া এবং কমলের তদ্বিষয়ে সম্মতিটা কোনক্রমে লইয়াই সে সরিয়া পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ ইহা ছাড়া আর উপায় ছিল কি?

অগণিত মিলন-উষার স্তূপীকৃত শিশিরবিন্দু যে বরফের মত চাপ বাঁধিয়া তাহারই ঘাড়ে জমিয়া উঠিবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা ছিল কি? হরেন্দ্রের মুখে আদ্যোপান্ত শুনিয়া নীলিমা আর্দ্র হইয়া কহিল; "আহা মেয়েটি এদিকে কিন্তু খুব ভালো, ভারী নিরহঙ্কার।"

নিমন্ত্রণের দিন ঠিক সময়ে আসিল কমল। মালিনীকে সংবাদ পাঠানো হইয়াছিল কিন্তু হঠাৎ তাঁহার বুকে ফিক্ বেদনা ধরায় আসিতে পারিলেন না, তবে তিনি ঘরেই সকলের স্বাস্থ্যপান করিবেন জানাইয়া পাঠাইলেন। কমল পদব্রজে এবং ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া অবিনাশবাবু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া কমল বলিল, "কি অবিনাশবাবু, ছেঁড়া কাপড় পরে হেঁটে এলাম দেখে অবাক হচ্ছেন? আশ্চর্য্যের কিছু নেই এঁতে। ছেঁড়া কাপড়ের কথা যদি বলেন তবে ব'লব 'ইয়ম-ধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।' আর হাঁটাহাঁটির কথা আর বলবেন না। আজীবন ত এক রকম হেঁটেই কাটিয়ে দিলাম বললে হয়। এক একদিন বিশ তিরিশ মাইল হেঁটে চলে গেছি, কাঠ ফাটা রোদও গ্রাহ্য করি নি। কোন কাজে নয়—শুধু পথচলার আনন্দে। সেদিন শুধু অজিতবাবুর কৃপায় মোটর চড়েছিলাম, সে অবশ্য চড়বার মত চড়া। তবে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সইল না, নিজেও গেলেন উল্টে, আমাকেও দিলেন উল্টে। সেদিন থেকে এই ডান হাতটায় এমন ব্যথা লেগেছে যে কোন কাজই করতে পারছি না, বাঁ হাতেই খাওয়া দাওয়া করতে হচ্ছে। আশুবাবুর কাছে নাকি ধনেশ পাখীর তেল আছে, বাতবেদনার মহৌষধ, তা মনে করে' যে আনব সে আর হ'য়ে উঠছে না, ওঁর ওখানে গেলেই একটা না একটা ফ্যাসাদ লেগে

আছে”, বলিয়া সে অবিনাশের দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিল।

অবিনাশ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন, তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন, “না, না, কি যে তুমি বল, ফ্যাসাদ কিসের! ছোটগিন্নি, এরই নাম কমল, আশুবাবু বলেন ‘শিবু’। তোমার রান্নার জোগাড় বোধ করি কম্‌প্লীট্? তবে আর দেরী কিসের, ওঁকেও ত আবার ফিরতে হবে—এখানে আর ঘরের তেমন সঙ্কুলান নেই যে…”

এ সকল জিজ্ঞাসাবাদের অনেকটাই বাহুল্য উত্তরের আবশ্যকও হয় না, প্রত্যাশাও থাকে না।

ভিতরে আসিয়া কমল আহার্য্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল তার পর বলিল, “আমারই ভুল হ’য়ে গেছে, তখনই হরেনবাবুকে বলে’ দেওয়া উচিত ছিল। আমি এসব খাবার স্পর্শ করি না। অধিকাংশ দিনই নিরম্বু উপবাস, যেদিন নিতান্তই খেতে হয় সেদিন একমুঠো আলোচাল আর একটা কাঁচকলা, যাক যা হবার তা হয়ে গেছে…”

নীলিমা মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, “সে কি কথা! আপনি হবিষ্যি ক’রতে যাবেন কেন? এত জিনিষ কি তাহলে নষ্ট হবে?”

কমল শুধু একবার হাসিল, কহিল, “নষ্ট যা হবার তাত হ’য়েই গেছে, তার উপর আমি আর নষ্ট হই কেন! অজিতবাবুও সেদিন এমনি একটা কথা বলে রাগ করে’ চলে’ গেলেন, ব’ললেন—খাবার সংযমটাই সত্য আর যৌন সংযমটা মিথ্যা! আমি সেদিন তাঁকে বলেছিলাম যে নরনারীর মিলনের নূতনত্বে প্রাণ আছে, বেঁচে থাকার আস্বাদ তাতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই যে কালিয়া পোলাও, একবার এর আস্বাদ

পেলেই হ'য়ে গেল, যতবার খাবেন সেই একই রকম ; মশলাও রাঁধবার তারতম্যে যেটুকু তফাৎ হয়ে থাকে তাকে অগ্রাহ্য করা চলে। কাজেই বার বার ওসব খাওয়ার অভ্যাসটা মনের জড়ধর্ম্ম, মৃত্যুরই নামান্তর। আমি ওর মধ্যে নেই হরেনবাবু, তার চেয়ে ওল-ভাতে ভাত খেয়ে থাকব কিন্তু জীর্ণসংস্কারের দাসত্ব করব না।"

নীলিমা কাতর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "শুধু আজকের জন্ত একটি দিনের মতও কি এর ব্যতিক্রম হ'তে পারে না ?"

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল 'না'—তাহার হাসিমুখের একটি মাত্র শব্দ। শুনিলে হঠাৎ কিছুই মনে হয় না। কিন্তু ইহার দৃঢ়তা যে কত বড় তাহা বুঝিল হরেন্দ্রের কান। সেই শুধু বুঝিল যে দিনে নক্ষত্র উঠা সম্ভব, রাত্রে সূর্য্য উঠা সম্ভব, কিন্তু কাঁচকলা ও ওল-সিদ্ধ ব্যতীত অন্ত কিছু কমলকে খাওয়ানো সম্ভব নহে। তথাপি সে হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে আমার আশ্রমের ছেলেদের ডেকে আনব ? তারা এলে এখুনি সব ছ'মিনিটে ফুঁকে দিয়ে যাবে।"

কমল নীলিমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই সে বলিল, "আশ্রম অর্থে কয়েকটি বজ্জাত ছোকরার আড্ডা আর কি! পাঁঠার পাল। হরেন ঠাকুরপো তাদিকে ধরে' প্রাণায়াম শেখাচ্ছেন বোধ করি, আর শ্রীমদ্ভাগবৎ থেকে রাসলীলার ব্যাখ্যা পড়ে' শুনাচ্ছেন, কারণ এরই মধ্যে তারা বেশ তালিম হ'য়ে উঠেছে। সেদিন ওদের দুজন আশ্রমের চাঁদা চাইতে এঁর কাছে এসেছিল, উনি ছিলেন পায়খানায়। তা একটিবার ওখানটিতে ঢুকলে দু'টি বর্ম্মা চুরুট আর এক হপ্তার জমানো যত খবরের কাগজ সব শেষ না করে' উঠবেন না, ঐটিই যেন জীবনের মধ্যে সব চেয়ে আরামের জায়গা! যাই হোক বাধ্য হ'য়ে আমাকেই চাঁদা দিতে বার হ'তে হ'ল, একটা ছোঁড়া আমার মুখের দিকে এমন

করে' চেয়ে রইল যে চোখে আর পলক পড়ে না! আমি বললাম তা বাছা হরেন ঠাকুরপো ত তোমাদের বেশ শিক্ষা দিচ্ছেন! সে তাতেও দমল না, আম্‌তা আম্‌তা করে বলে কি—আপনার নামটি কি? এই বলছি, বলে' ঘরের কোণ থেকে ঝাঁটাগাছটা হাতে ক'রতেই চম্পট দিলে।"

হরেন্দ্র কহিল, "তা হোক কিন্তু চরিত্রবান ভালো ছেলে তারা, আমি তাদের বড্ড ভালবাসি।" তারপর কমলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "যাবেন একবারে তাদের দেখতে? আপনাকে দেখলে তারা যথার্থই খুসী হবে।" এই বলিয়া সে কাতর দৃষ্টিতে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমল বুঝিল তাহার উত্তরের উপরেই হরেন্দ্রের আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। বলিল, "তা যেতে পারি কিন্তু উগ্র তপস্যার ক্ষেত্রে সাহসিকা অপ্সরার মত গিয়ে দাঁড়ালে আবার তপোভঙ্গ হবে না ত?"

হরেন বলিল, "না; আমরা তেমন বাহ্যাড়ম্বর ক'রে তপস্যা করি না।" সহসা নীলিমাকে দেখাইয়া বলিল, "আমাদের আদর্শ হচ্ছেন উনি। ঐ বৈধব্যের বেশ, বৈরাগ্যের অন্তরালে ভরা যৌবনের স্রোত, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না, কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তলে ফল্গু নদীর প্রবাহ দিয়ে অবিনাশবাবুর জীবনটিকে সিক্ত করে' রেখেছেন। অথচ এদিকে কি কঠোর আত্মশাসন! ঐ পাতলা থান কাপড় আর আধধির সেমিজ চিরকাল দেখে আসছি, পান দোক্তা ছাড়া কোন নেশাই নেই, গরদের রুমাল ক'খানি নিজের হাতেই কেচে ব্যবহার করছেন। ঐ আদর্শেই আমি আমার আশ্রমের ছেলেদের গড়ে তুলতে চাই, সেজদার মা-মরা সন্তানের উনিই জননী!"

নীলিমা বলিল, "তোমার আশ্রমের ছেলেরাও যে যত পিতৃহারা সন্তানের জনক হ'য়ে দাঁড়াবে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই হরেন ঠাকুরপো।"

হরেন্দ্র বলিল, "উপহাসের কথা নয়, এই হ'ল ভারতের অতীত যুগের আদর্শ, এই আদর্শ অনুসরণ করেই ভারতের পুরুষ আজ পুরুষ, ভারতের নারী আজ নারী।"

কমল এতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিল, "হায়রে ভারতের অতীত যুগের আদর্শ, আর তার সনাতন বৈশিষ্ট্য! এর উপর এত মমতা কেন তা বুঝতে পারি না। যদি ভারতীয়ের ছাপটা একবার মুছে ফেলে শুধু আরব অথবা বেদুইনদের মনুষ্যত্ব নিয়ে আমরা দাঁড়াই তবে তাতে ক্ষতিটা কি? লোকে ব'লবে তোমরা তবে হিন্দুস্থানের অধিবাসী নও, তোমরা কামস্কাট্‌কা কিংবা হনুলুলু দ্বীপের লোক। বেশ ত, কি আসে যায় তাতে? বিশ্বের প্রাণীজগতের একজন বলতে ত কেউ বাধা দেবে না! চিড়িয়াখানার সাদা ভালুক যদি বলে যে না আমার মেরুদেশে বাস নয়, এই সাদা চামড়া আর স্যাঁতসেঁতে জায়গার মোহ দুই-ই অস্বীকার করতে পার, এমন কি এরা যে আমাকে এই চিড়িয়াখানায় ধরে' এনে রেখেছে এও মিথ্যা বলে' মান্‌তে পার, শুধু এইটিই বিশ্বাস কর যে আমি জগতের একটি ভল্লুক বিশেষ, কেমন তা করতে বাধ্য কি না?"

হরেন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অবিনাশ সহসা জবাব খুঁজিয়া পাইলেন না।

কমল নিজের মনেই বলিতেছিল, "আমাদের চা-বাগানের হরিশ বাবুর কথাটা মনে পড়ে। স্ত্রীবিয়োগ হবার পর সনাতন বৈশিষ্ট্যের ধাপ্পা লাগিয়ে ষোল বছরের বিধবা বোন্‌টিকে ঘরে এনে বল্‌লেন,

'লক্ষ্মী, এরাই তোর পেটের ছেলে বলে' মনে করবি। সকলে বল্‌লে আহা লক্ষ্মীটার একটা কিনারা হ'ল। কিন্তু আমি ত জানি মেয়েদের এতবড় কর্ম্মভোগ আর নাই!"

হরেন্দ্র কহিল, "তার পর?"

"পরের খবর জানিনে হরেনবাবু, লক্ষ্মীর সার্থকতার শেষ দেখবার আগে নিজেরই সার্থকতার খোঁজে চলে' আসতে হয়েছিল, কিন্তু ঐ যে আমার গাড়ী এসে দাঁড়াল।" এই বলিয়া কমল তীরের মত ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সে সত্যসত্যই চলিয়া যায় দেখিয়া হরেন্দ্র রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "আশ্রমে কিন্তু যাওয়া চাই তা হ'লে, বলুন যাবেন, তা না হ'লে সব পণ্ড হবে।"

কমল যাইতে যাইতে বলিল, "তা যেতে পারি, তবে ছোঁড়ারা যদি বদমায়েসী করে?"

"বেশ, আমি তাদের ঘরে পূরে তালাবন্ধ ক'রে দেব।"

"তবে পরশু যাচ্ছি, যখন হোক্‌।"

কমল বাহির হইয়া গেলে হরেন্দ্র ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া দ্রুত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। নীলিমার দুই চক্ষের তারকা অবিনাশের দিকে চাহিয়া যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতে লাগিল। অবিনাশ ধীরে ধীরে খবরের কাগজটি উঠাইয়া মুখে চাপা দিলেন।

হরেন্দ্রের আশ্রমটির বিষয় দুই চার কথা এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্যোক্তা ও পরিচালক ছিল দুইটি ব্যক্তি, রাজেন্দ্র এবং সতীশ। উভয়েই হাওড়া জেলার বিশেষ কোন স্থানে পাশাপাশি গ্রামের ছেলে ও পরস্পর বন্ধু। রাজেন্দ্র গ্রামের স্কুলে বরাবর ফার্ষ্ট হইয়া ডবল প্রমোশন পাইত এবং পরীক্ষার সময় সতীশ তাহার পাশে বসিয়া কখনও রাজেন্দ্রের সমকক্ষ কখনও বা কিঞ্চিন্ন্যূন হইয়া পাস করিয়া যাইত। কিন্তু রাজেন্দ্রের প্রতিভার এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে সে যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইত তদ্বিষয়েই তাহার আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইত। যেখানেই যায় সেখানেই ডবল প্রমোশন ও স্কলারশিপ পাইয়া লেখাপড়ায় তাহার অরুচি ধরিয়া গেল। সে ভাবিল পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া দেশোদ্ধার করিবে। কাজেই সতীশও পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া তাহার সহিত কাজে লাগিল। গ্রামস্থ অনেক ছোক্‌রা, যাহারা যাত্রার দল করিয়া বেড়াইত এবং রাত্রে প্রতিবেশীর পুষ্করিণী হইতে মৎস্যাদি ধৃত করিত, কদলীর ঝাড় হইতে কদলী আহরণ করিত এবং উক্ত জেলায় বহুল পরিমাণে সমুৎপন্ন তালবৃক্ষের অত্যুৎকৃষ্ট নির্য্যাস রাত্রিযোগে উপরোক্তরূপে আহৃত উপযোগী খাদ্যদ্রব্যের সহিত সেবন করিয়া মনের ও প্রাণের জড়ধর্ম্ম দূর করিত. তাহারাই রাজেন্দ্র বা সতীশের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। হরেন্দ্রের কোন আত্মীয় ইহাদের মধ্যেই বাস করিতেন এবং ইহাদের গতিবিধি সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া হরেন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইলেন। হরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিল না, সমূহ দলটি আগ্রায় আনাইয়া লইল এবং

তাহাদের কার্য্যকলাপ অব্যাহতভাবে চালাইবার জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিল। তৎপূর্ব্বেই কিন্তু উহারা পুলিসের নজরে পড়িয়াছিল। একদিন থানার দারোগা রাজেন্দ্রকে ডাকিয়া রীতিমত প্রহার দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের জ্বালায় কি কারো পুকুরে মাছ আর কারো তালগাছে ভাঁড় থাক্‌বার জো টি নেই!" সেই হইতে রাজেন্দ্রের দেশোদ্ধার কার্য্যে বেশ অনাসক্তি দেখা দিয়াছিল, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত একটা কিছু ঘটিলে রাজেন্দ্র আর টিকিতে চাহে না, নূতন পথ অন্বেষণ করে। কাজেকাজেই আগ্রায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইল বটে, রাজেন্দ্র যেন সর্ব্বদাই ফাঁকে ফাঁকে কাটাইতে লাগিল। একবার যা সেই সকাল সন্ধ্যায় খাইবার সময় আসিত, বাকী সারাদিন সারারাত্রি কোন একটা গাছতলায় অথবা কাহারো বাড়ীর কাঁদালে পড়িয়া থাকিত। ইহাতে হরেন্দ্র কম ক্রুদ্ধ হইল না, সতীশও বড় কম ব্যথিত হইল না, আশ্রমের অন্যান্য চেলারাও বড় অল্প মর্ম্মাহত হইল না। ফলে সকলে চিন্তা করিতে লাগিল যে রাজেন্দ্রকে কোন একটা দোকানে খাতা লিখার কাজ অথবা কাহারও বাড়ীর বাজার সরকার করিয়া দিতে পারিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। Ostensible means of subsistence না দেখিয়া পুলিস যে-কোন দিন তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। হরেন্দ্র তাহার কাজের চেষ্টাও যে করিতেছিল না তাহা নহে কিন্তু রাজেন্দ্রের চেহারাটা এরূপ মন্দ ছিল যে লোকে তাহাকে দেখিলেই চোর বলিয়া সন্দেহ করিত। ঠোঁট চাপা, চোখ অত্যন্ত ছোট আর কালীর হাতে নিশুম্ভের মুণ্ডের মত মাথাটার সামনে টাক, পশ্চাতে বাদামী রঙের কয়েক গুচ্ছ মাত্র খোঁচা খোঁচা চুল। হরেন্দ্র বাস্তবিক বিপদে পড়িয়াছিল, রাজেন্দ্রের কেশকর্ত্তন করিয়া দিয়া এক প্রকার নেড়া করিয়া দিলেও মন্দ

দেখাইবে না বিবেচনা করিয়া অনেকদিন যাবৎ তাহা চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু নাপিতের দেখা পাওয়া যায় ত তাহাকে পাওয়া যায় না—তাহাকে পাওয়া যায় ত নাপিত পাওয়া যায় না। ঠিক এইরূপ অবস্থাটিতেই একদিন হরেন্দ্রের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কমল, নীলিমা ও অবিনাশ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

সতীশের উপরই সব দেখান শুনানর ভার, প্রথমতঃ অভ্যাগত-বৃন্দকে সে রান্নাঘরের দিকে লইয়া গেল। সকলে যাইয়া দেখিলেন একটি ছোকরা মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছে, তাই বলিয়া ঘুমাইতেছে না, আশ্রমে কর্ম্মহীন অবস্থায় অবস্থান নিষিদ্ধ—সে শুইয়া শুইয়া সুর করিয়া গীতগোবিন্দ পড়িতেছে। অপর একজন অদূরে বসিয়া আলুর খোসা ছাড়াইতেছে, সেই সঙ্গে বোধ করি কোন যৌগিক প্রক্রিয়াও করিতেছে, কারণ তাহার দৃষ্টি নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ। তৃতীয়টি, সেটির বয়স কিছু বেশী, এক হাতে উনান ধরাইতেছে, অপর হাতে একটি রুদ্রাক্ষের মালা জপ করিতেছে। উনানের উপরে দেওয়ালের গাত্রে সতীশ, হরেন্দ্র ও রাজেন্দ্রের একটি ফোটো বিলম্বিত রহিয়াছে। ফোটো-খানিতে হরেন্দ্র ধ্যানস্থ অবস্থায় বসিয়া আছে, সতীশ একটি ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বুক-ডন করিতেছে এবং রাজেন্দ্র বামহস্তের করতলে একটি লাঠি দাঁড় করাইয়া তাহার অগ্রভাগের দিকে চাহিয়া আছে। ধ্যান, শক্তি এবং ধারণা এই কয়টির প্রতীক বর্ণনাই ছবিটির উদ্দেশ্য। দ্বারপ্রান্তে আগন্তুকেরা আসিতেই যে যাহার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একটি লাইন হইয়া দাঁড়াইল। আলু ছাড়ানর ছোকরাটি ইংরেজি কায়দায় অভ্যাগতগণকে স্যালিউট্ করিল, গীতগোবিন্দেরটি মুসলমানী কায়দায় কুর্নীশ করিল এবং মালা জপ ও উনান ধরানরটি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। আবার তাহারই দেখাদেখি অপর দুইজনও পুনরায় ভূমিষ্ঠ

হইয়া প্রণাম জানাইল। কমল বিস্মিত হইয়া হরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "এর মানে?" অবিনাশ বলিতে যাইতেছিলেন, "মানে নেই, এম্‌নি", কিন্তু সতীশ অগ্রসর হইয়া কহিল, "অর্থাৎ বর্ত্তমান ইংরেজি ম্লেচ্ছতা, তার পূর্ব্বে মুসলমানি ম্লেচ্ছতা উভয়কে অতিক্রম করিয়া আমরা হিন্দুর সনাতন সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিলাম।" বলা বাহুল্য, ইহা পূর্ব্ব হইতেই ছেলেদিগকে শিখান ছিল। নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা বাছারা, তা তোমরা বুঝি নিজেরাই রান্না কর?"

বয়োজ্যেষ্ঠ ছোকরাটি বলিল, "আর্য্যে, যথার্থ ই অনুমান করিয়াছেন।"

"তা তোমাদের আজ কি রান্না হচ্ছে?"

"আজ রবিবার, তাই শুধু আলুর দম ও খিচুড়ি, বাৎস্যায়নের সূত্রে এইরূপ ব্যবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়। অন্যান্য দিবসে কদলীসিদ্ধ সহযোগে শাকান্ন গ্রহণই বিধি।"

নীলিমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। সে ছেলেবেলা হইতেই কাঁচকলাটা একেবারে পছন্দ করিত না, মাতুলালয়ে একবার শীতলার প্রসাদ খাইতে বসিয়া কাঁচকলা এবং পাকা কাঁঠালের সহিত ভেট্‌কী মাছের তরকারি তাহার পাতে দেওয়ায় সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সমাগত অতিথিগণের গায়ে তাহা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। সেই কাঁচকলাই আশ্রমের ছোকরাদের দৈনন্দিন খাদ্য। কল্পনা করিতেও তাহার বুক ফাটিয়া গেল, সে উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া দেখিল কমলের অন্তরেও বোধ হয় রোদনের সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। নচেৎ তাহার মুখের ওরূপ ভাব কেন? সে হাসিতেছে কি কাঁদিতেছে বুঝা যায় না, বোধ করি হাসিবার চেষ্টা করিলেও তাহা বিকৃত হইয়া রোদনে রূপান্তরিত হইবার উপক্রম

করে এবং বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসিলে উভয়েই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এখানেও তাহাই হইল। ভয়ের আক্রমণে অজিতের প্রেম-রিপু একপ্রকার অন্তর্হিত হইয়াছিল, এই ভদ্রলোকের গাড়ীর আলো চোখে লাগাতে এবং তিনি পেট্রল চাওয়াতে, সে ত জানিত কি না পথে তেল ফুরাইলে কি দুর্ভোগ—কতদিন তাহাকে পাঁচ সাত মাইল একা গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে, ফলে তাহার ভয়ের বেগও প্রশমিত হইয়া আসিল। সে পুনরায় গাড়ী start দিয়া সহরের দিকে ফিরিল। কমলের বাহুপাশ হইতে তখনও সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই; কমল তাহাকে জড়াইয়া রহিল, সে গাড়ী চালাইতে লাগিল। চলিতে চলিতে কিন্তু অজিত কমলকে প্রশ্ন করিল, "দেখ, ভাগ্যে হাঁচিটা এল, ষাঁড়েও পরস্পর একটা কাণ্ড বাধিয়ে দিলে, ভয়ে কাবু হ'য়ে গেলাম, না হ'লে কি হ'ত বল দেখি! গাড়ীর আলোতেই যখন নিস্তেজ হ'য়ে পড়লাম, সকাল হ'লে ত গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, অথচ তোমার মত একজন জ্ঞানবান স্ত্রীলোক এইটাকেই ত প্রশ্রয় দিয়েছিলে—এটাকে একটা জোচ্চোরি, দাগাবাজি, মিথ্যাকথা জেনেও!"

কমল ক্ষণকাল তাহার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল, অন্ধকারে তাহার চোখ যেন আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল। তারপর একটি চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া অতি নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, "দেখুন সত্য-মিথ্যা নিয়ে যে সমাজের আদিম কাল থেকে এই একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এটার চেয়ে বোধ করি আত্মপ্রবঞ্চনা আর কিছুই নেই। আপনি কি মনে করেন ফুলওয়ালী ফুলের ঝুড়ি মাথায় করে' যায় সেই-ই সত্য আর মেথরানী ময়লার টব মাথায় করে যায় সেইটা মিথ্যা! দুই-ই সত্য, না হয় দুই-ই মিথ্যা, না হয় এ দুইএর কোনটাই নয়। কই ময়লার গন্ধকে ত অস্বীকার করতে পারেন না! আর মানুষ যে

তার শরীরের নিকৃষ্টাংশ পরিত্যাগ করে এও সত্য, সেটা পরিত্যাগ না ক'র্লে কত-বিপদই যে এসে দেখা দেয় সেও ত জানতে বাকী নেই!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিতে সুরু করিল, তৎপূর্ব্বেই একবার হাসিল, হাসিল যে তাহা অজিতের দৃষ্টি এড়াইল না, কারণ কমলের নাসিকাটি স্বভাবতঃই অতিশয় উচ্চ, হাসিলে তাহা উচ্চতর দেখাইত—অন্ধকারেও তাহা স্পষ্ট দেখা গেল,—"লোকে বলবে বেশ ত সত্যই যদি হয় তবে সেটা নিয়ে কি মাথামাখি ক'রতে হবে? সেটা যে দুর্গন্ধ তা ত আর অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু হায়রে, কোন্‌টা সুগন্ধ আর কোন্‌টা দুর্গন্ধ তার খবর অন্তর্যামীই জানেন, ওটা সামাজিক রুচি ব্যতীত আর কিছুই নয়, একজনের কাছে যেটা হেয় অন্যের কাছে সেটা শ্রেয়, আবার vice versa."

অজিত কোন কথা কহিল না, কহিবার কিইবা ছিল? কিন্তু হঠাৎ সে যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, কহিল, "তাই না হয় হ'ল; কিন্তু এরূপ অবৈধ মিলনের ফলে যে সব শিশু জন্মাবে তাদের দশা কি হবে?"

কমল তেমনি হাসিয়া বলিল, "পিতামাতা বলে একটা সামাজিক সংস্কার দাঁড়িয়েছে বইত নয়! কেন কেউ যদি তার বাপের পরিচয় না দিতে পারে লজ্জার কি আছে বুঝি না, আমারই ত পাঁচটি মেয়ে অর্ফ্যান্‌স্ হোমে আছে, তাদের বাপকে ত আমিই জানি না। এর পর যদি তারা আমায় জিজ্ঞেস করে কে তাদের জন্মদাতা, আমি বলব, 'সত্য'। অর্থাৎ যে ক্ষণিকের মোহে তারা জন্মগ্রহণ করেছে সেইটাই সত্য।"

অজিতের মনে যুক্তিটা অনেকখানি প্রাণস্পর্শী হইলেও একটা সন্দেহ ঘুচিতেছিল না, বিড় বিড় করিয়া বলিল, "সত্য, সত্য ত একটা abstract noun, ও কি করে বাপ হবে!"

কমলও ফিস ফিস করিয়া বলিল, "এম্‌নি।"

এমন সময় হঠাৎ কে গাড়ীতে লাফ দিয়া উঠিল, অজিত তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কে তুই, বল।"

লোকটি রাজেন্দ্র, সে কহিল, "ভয় পাবেন না, আমি রাজেন, সেই সন্ধ্যে থেকে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি আপনাদের অপেক্ষায়, তার পর যখন গাড়ীটা এঁর বাসা ছাড়িয়ে চলল, বাধ্য হ'য়ে লাফ দিয়ে উঠলাম, কিছু মনে করবেন না। শিবনাথবাবুর আশুবাবুর বাসায় মর-মর অবস্থায় পড়ে আছেন, তাই খবরটা দেওয়া দরকার।"

কমল বলিল, "তা বলে' এই চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে উঠতে হয়! যদি একটা accident হ'ত!"

"এ আমার কাজ, প্রয়োজন হ'লেই সংবাদ দেবেন।" এই বলিয়া সে যেমন উঠিয়াছিল, তেমনি গাড়ী হইতে লাফ দিয়া নামিয়া গেল। ভূমিকা নাই, আড়ম্বর নাই, সাদা কথায় জানাইয়া গেল এ তাহার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত! কমলের মনে পড়িল আজই হরেন্দ্র সন্ধ্যায় বলিয়াছিল ইহার অসাধ্য কর্ম্ম জগতে কিছুই নাই। শুধু যে কাজটি অনায়াসে করিতে পারে তাহারাই উপর ইহার অনাসক্তি। বুঝিল অবলীলায় গাড়ীতে উঠিয়াছে তাই বেশীক্ষণ থাকিবার স্পৃহা নাই, অবহেলায় নামিয়া গেল। যদি কোথাও আঘাত লাগিত তবে বার বার উঠিবার চেষ্টা করিত সন্দেহ নাই।

তাহারা আশুবাবুর ঘরে পৌঁছিয়া দেখিল আশুবাবু সেই ঈজি-চেয়ারটিতে শুইয়া আছেন, ঘরে একটি অনুজ্জল প্রদীপ জ্বলিতেছে, আশুবাবু ঘুমের ঘোরে অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটের পোড়া দিকটি এক একবার মুখে দিয়া টানিতেছেন, তবে তাহা বহুক্ষণ নির্ব্বাপিত হইয়া যাওয়ায় ঠোঁটে ছ্যাঁকা লাগিতেছে না। এরা ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি চক্ষু বুজিয়াই

নিদ্রাজড়িত স্বরে বলিলেন, "এতক্ষণে এলে বাবা, দেশলাইটা একদম সেঁতিয়ে গেছে, একটু আগুন-তাতে ধরতে পার ?"

অজিত হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার এই নৈশ অভিযান সম্বন্ধে কিছুই ত মন্দ তিনি মনে করেন নাই, বৃদ্ধটির অন্তরটা ঠিক যেন ফুলস্ক্যাপ কাগজের ন্যায় সর্ব্বদা ধপ্ ধপ্ করিতেছে, ভালমন্দ কিছুই সেখানে স্থান পায় না, মস্তিষ্কটি সর্ব্বদা ধোঁয়ায় ভরিয়া আছে। কমল প্রদীপটি হাতে করিয়া আশুবাবুর মুখের চুরুটটি সোজা দিকে তাঁহার মুখে ধরিয়া দিয়া প্রদীপের আগুনে তাহা প্রজ্বলিত করিয়া দিল। আশুবাবু জলন্ত চুরুটে একটি পরিপূর্ণ টান মারিয়া চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, "চল শিবনাথকে দেখে আসি, বেচারা জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে পড়ে আছে, মণি এখনি এসে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, বাবা কাঠের যোগাড় করে রাখ কখন যে কি হয় বলা যায় না, রাত্রে কি শেষে একটা হাঙ্গামায় পড়বে !"

সকলে মিলিয়া শিবনাথের ঘরে আসিয়া দেখিলেন শয্যায় শিবনাথ ও মনোরমা পাশাপাশি কণ্ঠলগ্ন হইয়া শুইয়া আছে, শয্যার পার্শ্বেই একটি টিপয়ের উপর মোমবাতি জ্বলিতেছে। তাহা জ্বলিয়া কাত হইয়া পড়িয়াছে, আর একটু হইলেই মনোরমার গায়ে পড়িয়া যাইবে—ইহা দেখিবামাত্র প্রতীতি হইল। অথচ উভয়ে সুপ্ত, কাপড়ে আগুন লাগিয়া গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য। আশুবাবুর দুই চক্ষু ব্যাপিয়া যেন ঘনান্ধকারের জাল নামিয়া আসিল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল মাত্র। টিপয়ের উপর একটি কাঁচের গ্লাসে খানিকটা জল ছিল, আশুবাবু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই অজিত পা টিপিয়া অগ্রসর হইল এবং গেলাসের জলটা মোমবাতির উপরে ঢালিয়া দিল। আলোটা নিভিয়া গেল বটে কিন্তু বলা বাহুল্য যে মনোরমার গায়েও খানিকটা জল পড়ায়

সে "উঃ" করিয়া উঠিল। তখন অজিত এক হাতে আশুবাবু ও অন্য হাতে কমলকে ধরিয়া যেমন উহারা আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত মনোরমার বিশ্বাস ছিল যে সে দিন রাত্রে ঘরে চোর ঢুকিয়াছিল।

১৩

শিবনাথের রীতিমত একটা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা দরকার বিবেচনা করিয়া আশুবাবু পরদিন হরেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রভৃতিকে ডাকাইয়া আনিলেন, অজিত ও কমল ঘরেই ছিল। আশুবাবু সর্ব্বাগ্রে কমলকে বলিলেন, "শিবনাথের ভার তোমাকেই নিতে হয়, নিজের স্বামীকে যদি না দেখ আমি যে মারা যাই। হতভাগা মেয়েটাও হয়েছে শিবনাথের এমনি ন্যাওটো যে একতিল ছাড়তে চায় না, দিনরাত রুগীর বিছানায় শুয়ে আছে। শরীরটাও ওর গেল ঐ করে। যাই হোক, ওষুধপত্রের খরচা না হয় আমি দেব—"

কমল বাধা দিয়া বলিল, "থামুন, একটা কথা আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার। শিবনাথ বলে এই লোকটি যে আমার স্বামী ত আপনাকে বললে কে? যতদিন দু'জনের ভালবাসা ছিল ততদিন হয়ত এক সঙ্গে কাটিয়েছি, এই মাত্র। কিন্তু আজ যে প্রেমের বৃক্ষটি গেছে মরে, সেদিনকার ক্ষণগুলি যদিও উইএর মত গড়ে তুলেছে তার মৃত কাণ্ডটারই চতুষ্পার্শে স্মৃতির বল্মীক, আর সেই ক্ষণিক আনন্দগুলো পায়রার মত বুকের খোপে বেঁধেছে বাসা, কিন্তু আজ আবার অপর

একটি আমড়া গাছের শাখায় মুকুল ধরেছে, তার কচি পাতায় লেগেছে তরুণ সূর্য্যের আলো—"

আশুবাবু কহিলেন, "না না, এই সামান্য কারণে তুমি স্বামী ত্যাগ করবে! সে কি হয়?"

ঈষৎ হাসিয়া কমল বলিল, "বাইরে যদি আলো জ্বলে তবুও পিছন ফিরে ঘরের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে থাকতে হবে?" কিন্তু বোধ করি, এ প্রশ্ন আশুবাবুর কানে গেল না, তিনি নিজের ঝোঁকেই বলিতে লাগিলেন, "আজকাল নারীদের স্বাতন্ত্র্যের নাম দিয়ে বিলাতের অনুকরণ করাটা ফ্যাশান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বটে। কিন্তু ওতেই মরণ হবে তোমাদের তা বুঝতে পারছি,—" বস্তুতঃ তাঁহার রোখ চাপিয়া গিয়াছিল, "ওদের ভাবনা কি বল না, মা-ই কি বাপই কি, পক্ষান্তর গ্রহণ করলেই পূর্ব্বপক্ষের ছেলে মেয়েগুলির কত রকম ব্যবস্থাই না ওরা করে ফেলে, তা ছাড়া ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মেয়েরা ওসবের হাত এড়াবার জন্য কত রকম কৌশলই না করেচে, এখানে ত সে সব সহজে হবে না, কতগুলো চোর ছ্যাঁচোর, বদমায়েস, দাগাবাজের জন্ম দেওয়া বই আর কিছুত হবে না!

অজিত শুব্ধ হইয়া রহিল, সতীশ ও হরেন্দ্রের বিস্ময়ের পরিসীমা নাই। এই সাহেবী চালচলনের লোকটি আজ বলে কি? আশুবাবু কমলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—

"বুঝলে ত এইবার কেন তোমাকে এ অনুরোধ করেছিলাম?"

"না!"

"না? না কেন?"

"বিলাতের ব্যবস্থাগুলো পরিত্যাগ করে মান্ধাতার আমল থেকে যা চলে আসছে তাই গ্রহণ করবার কথা বলছিলেন। স্ত্রীলোক একটি মাত্র

পুরুষ ছাড়া ভাল বাসতে পারবে না এই ব্যবস্থাই যদি মান্ধাতার যুগ থেকে চলে এসে থাকে, তাই বলে কি সেটা যুক্তিযুক্ত হ'য়ে যাবে, না সেই পচা জিনিষকে চালাবার চেষ্টা করলেই সেটা স্বদেশ-প্রেম হবে? তা হবে না, বরং ওতে দেশের কল্যাণের দেবতা ক্ষুন্ন হবেন। যদি আপনার কাঁধে এমন একটি জাতের দাদ জন্মে থাকে যা আর কারও কাঁধে জন্মায় নি, তবে আপনার শরীর-রক্ষার কি এই ধর্ম্ম হবে যে সেই দাদটিকে যত্নে পুষে রাখা? একটি নারীর একটি মাত্র স্বামী এই যে ব্যাধিটি সমাজের মধ্যে জন্মেছে সেও ওই দাদের মত দুঃসহ, আর বোধ করি, তেমনই দুরারোগ্য!"

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "তোমাকে বুঝতে পারলাম না, কমল।"

"বোঝাবার কথাও নয় আশুবাবু, এমনিই হয়। কিন্তু রাত্রি হ'ল বোধ করি, এইবার আমি উঠি।"

"যেয়ো না কমল, আমার আর একটা কথার জবাব দিয়ে যাও।"

সে সত্যসত্যই চলিয়া যায় দেখিয়া হরেন্দ্র একটু তফাৎ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার আশঙ্কা হইতেছিল কমল এরূপ ক্ষেত্রে একটা dramatic move লইবেই, তবে তাহা অদ্য ঠিক কিরূপ আকারটি ধারণ করিবে তাহার নিশ্চয়তা কিছু ছিল না। ছেলেবেলায় হরেন্দ্র শুনিয়াছিল, ভূত ছাড়িবার সময় একটা কোনো নিকৃষ্ট বস্তু সঙ্গে লইয়া যায়, যাহা অবশ্য সামনে পড়ে। বস্তুত সে অপেক্ষা আর নিকৃষ্ট বস্তু পৃথিবীতে কি আছে? আজ কলিক, কাল মাথাধরা, পরশু কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি একটা না একটা ব্যারাম ত তাহার লাগিয়াই আছে। যাই হোক, তাহার ফাঁড়া কাটিল, কমল হঠাৎ রাজেন্দ্রের দুটি হাত ধরিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, "চল না ভাই আমায় পৌঁছে দেবে।" বলিয়া

যেমন ধরিয়াছিল তদ্রূপই তাহার হাত দুইটি দক্ষিণ বাহুর বগলে চাপিয়া রাজেন্দ্রকে সে এক প্রকার পিছনে পিছনে টানিয়া লইয়া গেল।

পথে আসিয়া কমল রাজেন্দ্রকে বলিল, "দেখ, শুনেছি তুমি বিপ্লবপন্থী, তাই যদি হয় তোমার বন্ধুত্ব অক্ষয় হবে!" পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহা অনায়াসসাধ্য তাহারই উপর রাজেন্দ্রের বিরাগ, কমলের সহিত তাহার ইতিপূর্ব্বে মোটেই আলাপ হয় নাই অথচ পথে বাহির হইয়াই সে পিরীত জমাইতে চাহিল, ইহাতে রাজেন্দ্রের মন চটিয়া গেল। সে রুক্ষ স্বরে বলিল, "মেয়ে মানুষের বন্ধুত্বটা যে কি কাজে লাগবে তাই ভাবছি, না পারবে দৌড়তে, না পারবে গাছে চড়তে, না পারবে দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে।" কমল বুঝিল, ইহার অকলঙ্ক পুরুষ-চিত্ততলে আজিও কোন নারীর প্রকৃত স্বরূপ ছায়াপাত করে নাই, কহিল, "দেখ, যাকে চেনো না তাকে অশ্রদ্ধা করে নিজেকে খাটো কোরো না। দরকার হলে আমরা সবই পারি।"

কিন্তু এ অনুযোগে লোকটি কুণ্ঠিত হইল না, বলিল, "তা হয়ত হতে পারে, কিন্তু সেটা পরীক্ষাসাপেক্ষ।" এই বলিয়া সে কমলকে চিন্তা করিবার অবসর না দিয়াই দৌড়িল। কমলের ন্যায় বুদ্ধিমতী নারীর পক্ষে বুঝিতে দেরী হইল না যে ইহা কেবল তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই। অগত্যা তাহাকেও দৌড়িতে হইল, সেও ছুটিতে পারিত মন্দ নয়। রাজেন কিয়দ্দূর গিয়া একটি বৃক্ষের অন্তরালে কমলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কমল সেখানে পৌছিতেই হঠাৎ লাফাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া রাজেন বলিল, "শিবানী!"

"আমার এ নামটাও তুমি জানো না কি?"

রাজেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "জানি। কর্ম্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয়ের নয়। দু'টো মনের কথা

দু'জনে কইতে পারলেই বন্ধুত্ব হয় না, বরং এই যে একসঙ্গে দু'জনে এতটা দৌড়ে এলাম এতেই আমাদের বন্ধুত্ব পাকাপাকি হল।” কমলও হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, জড়িতস্বরে বলিল, “সেদিন আমাদের বিবাহের অনুষ্ঠানে ফাঁকি ছিল, কিন্তু ফাঁক ছিল না, ভাবলাম এ ভালই হ'ল, ইচ্ছা করলেই একটা কাটান-ছেঁড়ান হয়ে যাবে, কোন বাঁধাবাঁধি রইল না!” রাজেন জিজ্ঞাসা করিল, “এ কথার মানে?”

“মানে নেই এম্‌নি!”

১৪

ইতিমধ্যে অনেক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। আগ্রা শহরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। হাওয়া বদলের নাম করিয়া শিবনাথ ও মনোরমা আশুবাবুর নিকট কতকগুলি টাকা লইয়া মাসকয়েক হইল ফেরার হইয়াছেন। আশুবাবু পুলিসে সংবাদ দিয়া উভয়ের ফোটো কাগজে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন; যদি টাকাগুলো কোন প্রকারে উদ্ধার হয়। কিন্তু সি, আই, ডি বিভাগ হইতে সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন পূর্ব্বে কান্দাহারে এক হোটেলে কাবুলি স্ত্রীপুরুষ সাজিয়া হিং বিক্রয় করিতেছিলেন, তারপর সেই হোটেলের অনেক জিনিষপত্র লইয়া কোথায় পলাইয়াছেন তাহার খবরাখবর নাই, তবে এ সম্বন্ধে আফগানিস্থান, পারস্য ও সুদূর চীন-দেশের পুলিস-বিভাগে সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে, তারপর ফলাফল সম্পূর্ণ ভগবানের উপর নির্ভর করিতেছে।

আশুবাবুর একটি অতি সৌখিন নেটের মশারি ছিল। বলিতে

ভুলিয়া গিয়াছি কমল সূচিবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল, কলিকাতার বড় বড় কারিগর তাহার নিকট হার মানিত। সে যে কোথায়ও কাহারও নিকট থাকিয়া এই বিদ্যা শিখিয়াছিল, তাহা নহে, তাহার সকল বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যাটিও স্বোপার্জ্জিত, একদিন হঠাৎ কি করিয়া শিখিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা কিছুই বলা যায় না। যাহা হউক, আশুবাবুর অনুরোধে তাঁহার পঞ্চষষ্ঠী গর্ভবাসোৎসব উপলক্ষে কমল এই মশারিটি স্বয়ং তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর উপযুক্ত সূচিকার্য্য করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিল। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। গর্ভবাসোৎসব কথাটি বোধ করি অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন না। আশুবাবু জন্মোৎসবের পরিবর্ত্তে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, মানুষের জন্মোৎসবটা কিছু নয়, বস্তুতঃ ওটা লইয়া হৈ চৈ করাটা নিতান্ত মূর্খামি, আসলে যেদিন তিনি মাতৃগর্ভে ধৃত হইলেন সেই দিন তিনি জগতে পদার্পণ করিলেন। হইলই বা তাহা অজ্ঞান ও অন্ধকারের যুগ, সৃষ্টির গোড়ায় ত সকলই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। সেকারণ তাঁহার actual জন্মদিবসের পূর্ব্বে দশ মাস দশ দিন হিসাব করিয়া একটি দিন ঠিক করিয়াছিলেন, এই দিন তাঁহার গর্ভবাসোৎসব হইত।

বলিতে পারি না, কি ভাবিয়া শিবনাথ ও মনোরমা আশুবাবুর উক্ত সখের মশারিটি তাঁহার অজ্ঞাতেই লইয়া পলাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি আশুবাবুর মুখে অবগত হইয়া কমল অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা মশারিটি চুরি যাওয়ার জন্য নয়; সে অনুমান করিয়াছিল, বোধ করি, তাহার স্মৃতির একমাত্র চিহ্নস্বরূপ শিবনাথ এটি সঙ্গে লইয়াছেন। তাহার সহিত এতদিনের সংসর্গে শিবনাথ কি শেষে এই শিক্ষা করিলেন? ইহার চেয়ে তিনি তাহাকে দু'ঘা মারিয়া গেলেন না কেন? তাহা সহ্য হইত, কিন্তু এ অপমান সে সহিবে কি করিয়া? একটা কেন,

অমন বিশটা মনোরমা তিনি সঙ্গে লইয়া যান তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং তাঁহার জীবনে যুগপৎ একাধিক সূর্য্য উঠিতেছে মনে করিয়া কমল তাহাতে খুশীই হইবে, কিন্তু এই গলিত কুষ্ঠের ন্যায় মৃত প্রেমের স্মৃতি তিনি আজীবন বহন করিবেন কি বলিয়া?

মশারিটার জন্য আশুবাবুরও অত্যন্ত আফশোস হইয়াছিল, বন্ধু-বান্ধবের কাছে প্রায়ই বলিতেন, "ছোঁড়াছুঁড়ি গেল গেল, আমার সখের মশারিটা নিয়ে গেল হ্যা।"

এদিকে কমল রাজেনকে লইয়া মাতিয়া উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহা অনায়াসলভ্য তাহারই প্রতি রাজেন্দ্রের বিরাগ। কমলের উপরও সে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে মুচিপাড়ায় আশ্রয় লইল। সেখানে ব্যাধিরামে অসংখ্য লোক মরিতেছিল, রাজেন্দ্র এক প্রকার তাহাদের মুদ্দাফরাসের কার্য্যে নিযুক্ত হইল; রোগীর সেবা করিয়া তাহাকে ভাল করা অপেক্ষা সে মরিলে তাহাকে টানিয়া ফেলিতেই রাজেন্দ্রের আনন্দ বেশী। কমলও বাধ্য হইয়া রাজেন্দ্রের সান্নিধ্যলাভের জন্য দিবারাত্র মুচিপাড়ায় কাটাইতে লাগিল। কিন্তু বেশী দিন টিকিয়া থাকা সম্ভব হইল না, দিন কয়েকেই ভয়ে তাহার দেহের রক্ত শুকাইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। বস্তুতঃ প্রেমরিপু অপেক্ষা ভয়রিপুর শক্তি অধিক, তাহা অজিতের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে, কমল তাহা হাড়েহাড়ে বুঝিল। যাই হোক, সে শেষ চেষ্টা দেখিবে মনস্থ করিয়া আরও দুই এক দিবস রহিয়া গেল। এমন সময় কিন্তু একটি ব্যাপারে তাহাকে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতে হইল! সে কয়দিন যাবৎ বাসায় আসিয়া ভাত রান্না করিত ও থালায় করিয়া তাহা লইয়া গিয়া রাজেনকে খাওয়াইয়া আসিত। কোনও মুচিবাড়ীর কাঁদালে দাঁড়াইয়া রাজেন ভাত কয়টি মুখে দিত। সেদিন রাজেনের

শরীরটা ভাল বোধ হইতেছিল না, তা ছাড়া, মড়া ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া তাহার দুই হাত অপরিষ্কার, কোথায়ও এক ফোঁটা জল নাই যে হাত ধুইয়া লয়, খাইয়া না হয় কাপড়ে হাত মুছিয়া লইবে, অধিকাংশ দিনই ত তাহাই করিয়া ক্ষান্ত হইতে হয়; কিন্তু হাত না ধুইয়া সে খাইবে কি করিয়া? কমল বলিল, "আমি না হয় তোমায় খাইয়ে দিচ্চি।"

অগত্যা রাজেন সম্মত হইল। কিন্তু সেই মোটর দুর্ঘটনার রাত্রি হইতে কমলের ডান হাতটি খোঁড়া, সে বাম হস্তেই রাজেন্দ্রকে খাওয়াইতে লাগিল। প্রথমটা রাজেন লক্ষ্য করে নাই, খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, আর মাত্র দুই এক গ্রাস বাকী আছে এমন সময় হঠাৎ তাহার জ্ঞান হইল যে জলশৌচ করিবার হাতেই কমল কার্য্যোদ্ধার করিতেছে। তাহার গা-টা কি রকম করিয়া উঠিল, সে হড় হড় করিয়া থালার উপর ও কমলের গায়ে বমি করিয়া দিল। কমলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিল, সে বাসায় আসিয়া গভীর রাত্রে কাপড়ে সাবান ঘসিতে ঘসিতে এই কথাই ভাবিতেছিল—অবশেষে কি না রাজেন্দ্র বমি করিয়া দিল। ব্যাপারটা তাহার ইচ্ছাকৃত কি না তাহা অবশ্য কমলের জানা ছিল না, সে চলিয়া আসিবার সময় বলি-বলি করিয়াও সে প্রশ্নটি রাজেনকে জিজ্ঞাসা করে নাই, ভাবিয়াছিল থাকৃগে, তাহার লাভ কি হইবে জানিয়া? কিন্তু প্রেমের বাজারে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া ঘরে ফিরিবার প্রাক্কালে রাজেন্দ্র তাহাকে বার বার বলিয়াছিল, "এমন নির্ভীকতা আমি জন্মে দেখি নি। ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন তাই মুচিগুলোও বাঁচল, আমিও বাঁচলাম। কিন্তু এবার আপনি যান, আর না। আমি বরং যাবার সময় এদের বলে' কয়ে' আপনার জন্য এক জোড়া মজবুত চটিজুতো নিয়ে যাব, বড্ড খালি পায়ে ঘোরাঘুরি করছেন।"

কমল এ কথার জবাব খুঁজিয়া পায় নাই, শুধু "হুঁ" বলিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, বস্তুতঃ ইহা ছাড়া তাহার আর বলিবার ছিল কি ?

১৫

প্রায় মাসাধিক কাল গত হইয়াছে। একদিন অপরাহ্ন বেলায় হরেন্দ্র আসিয়া হঠাৎ কমলের গায়ে একটা কাপড়ের পুঁটুলি ও এক তাড়া নোট ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "আজকালের মধ্যেই চাই কিন্তু, টাকাটা অগ্রিম দিয়েছে।" এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। কাপড়ের কারিগর হিসাবে ইতিমধ্যে আগ্রা সহরে কমলের যথেষ্ট সুনাম বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার রোজগারও যে হইতেছিল না তাহা নহে, বস্তুতঃ সে, মনে করিতেছিল তাহার ঘরেই দুই এক জন মুসলমান দর্জ্জি রাখিয়া ব্যবসা চালাইবে, দু' পাঁচজন ছোকরা-উমেদারও জুটিয়াছিল, কিন্তু কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আজকাল করিয়া কেবলই বিলম্ব করিতেছিল।

হরেন্দ্রের পুঁটুলি খুলিয়া কমল একটি দামী কাপড়ের থান ও পুরাতন পাঞ্জাবী একটি বাহির করিয়া শুঁকিতে লাগিল হরেন্দ্র ভাবিয়া পাইল না ইহার তাৎপর্য্য কি! কমলের একটি বিশেষ প্রতিভা ছিল, যে-কোনো পুরুষমানুষের একটিবার সান্নিধ্যলাভ করিতে পারিলে তাহার জামার গন্ধ কমলের নাকে লাগিয়া থাকিত,—মানুষের মধ্যে এরূপ ঘ্রাণশক্তি বিরল। বস্তুতঃই সে পাঞ্জাবীটার এদিক ওদিক বিশেষ করিয়া শুঁকিয়া যেন কতকটা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সেটি রাখিয়া দিল, তার পর হঠাৎ হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, "অজিতবাবু সৌখীন মানুষ।

তাঁর দামী কাপড়টা আমি নষ্ট করতে পারব না, আপনি বরঞ্চ এটা ফিরে নিয়ে যান।”

হরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, “কি করে জানলেন এটা অজিতবাবুর?”

কমল দাঁত বাহির করিয়া বলিল, “আমি হাত গুণতে পারি।”

হরেন অগত্যা স্বীকার করিল। কহিল, “সে কিন্তু বড় দুঃখ পাবে যদি আপনি ফিরিয়ে দেন। আশ্রমের ছেলেদের কাছে কালই সে বলছিল, তাদের অনেকে আপত্তি করেছিল যে ও কাপড় কমল কাটতে পারবে না, অজিত তর্ক করছিল, কেন এ ত আর সব সময় পরবার জন্ত নয়। এক হাত ছোট আর এক হাত বড় হলেই বা যায় আসে কি? এ শুধু জন্ম মৃত্যু শ্রাদ্ধ ইত্যাদি বিশেষ পর্ব্ব দিনে পরলেই চলবে, নচেৎ এ ত আমি ন্যাপথলিনের বড়ি দিয়ে ভাঁজ করে বাক্সে তুলে রাখব। ছেলেরা তখন স্বীকার করেছিল যে তা হ’লে হ’তে পারে। সত্যি বলচি, তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা বোধ করি আপনাকে কেউ করে না।”

কমল বলিল, “তবু আমার রান্না খেয়ে তিনি সেদিন মাথা কামিয়ে বোষ্টম হয়েছিলেন! আমি কিন্তু জানতাম যে তাঁর মাথাটা নেড়া হলেও মনটা নেড়া হয়নি, নচেৎ—” এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। বলিল, “ছি ছি, ও কি আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন না।” ভাবের আবেগে সে নিজের মনেই কথা বলিতেছিল, এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই যে হরেন্দ্র একটি লাঠির উপর ভর করিয়া ঝাঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বসিবার দ্বিতীয় স্থানও ঘরে ছিল না, বিছানাটার উপর কচু বেগুন পেঁয়াজ ছেঁড়া-কাপড় ইত্যাদি জমা হইয়া একটা বিশ্রী ব্যাপার হইয়াছিল। ঘরের মধ্যে আর একটি মাত্র স্থান জলচৌকিটি, তাহারই উপর বসিয়া কমল সূচিকর্ম্ম করিতেছিল। অগত্যা

হরেন্দ্রকে তাহারই এক পাশে বসিতে হইল, তবে পাশাপাশি বসিবার জায়গা না হওয়ায় পরস্পর পিছন ফিরিয়া বসিল, অর্থাৎ কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইল না। তবে কথাবার্ত্তা বেশ চলিতে লাগিল, বস্তুতঃ মুখ না দেখিতে পাইলে কথা বলা হয় না, ইহা উভয়ের কেহ বিশ্বাস করিত না।

কমল পিছন হইতে হরেন্দ্রের উদ্দেশে বলিল, "এই যে আপনাকে কাছটিতে বসতে বলা উচিত ছিল অথচ তা বলি নি। আপনি নিজেও ত গোড়া থেকেই এমনি বসতে পারতেন, অথচ তা বসেন নি। এর থেকে সংসারে কত অনর্থপাতই না হয়, অথচ এইটিই লোকে সব চেয়ে ভোলে বেশী।"

হরেন্দ্র সম্মুখের কাষ্ঠ-সিন্দুকটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "একি আমাকে বলচেন, না আপনার সুমুখের গাড়ুটাকে বলচেন?" সে ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছে কমলের সামনে একটি খালি গাড়ু পড়িয়া ছিল, "যদি আমার জন্য হয় ত স্পষ্ট ভাষায় বলুন, ওসব হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢুকছে না।"

কমল গাড়ুটার দিকে চাহিয়া বলিল, "হেঁয়ালিই বটে! সহজ সরল রাস্তা, মনে হচ্ছে যেন বেশ চোখ বুজে চলে যাওয়া যায়, বাস্তবিক খেয়ালের বশে গেছিও ত অনেকবার, কিন্তু পায়ে হোঁচটটি লাগলেই চৈতন্য জাগে —কেন পড়ে মরতে এমন চোখ বুজে চলবার খেয়াল হয়েছিল! এমনি করে, একদিন একজন বুড়ো ডিমওয়ালার ঘাড়ের উপড় গিয়ে পড়েছিলাম। তার মাথায় ছিল ডিমের ঝুড়ি, সেও পড়ল উল্‌টে, আর আমিও ডিমের গাদার উপর একেবারে লেপটে গেলাম। তবে সেই দিন ঘরে এসে কাপড় নিংড়ে ত্রিভঙ্গবাবুকে ডিমের চপ রেঁধে খাইয়েছিলাম।"

"ত্রিভঙ্গবাবুটি আবার কে?"

"শিবনাথের পূর্ব্বে তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি একজন পাটের

দালাল, নাক দিয়ে এমন বাঁশী বাজাতে পারতেন দূর থেকে ক্লারিওনেট বলে ভ্রম হ'ত! বড় দয়ার শরীর। আমাদের পাশের ঘরেই একজন স্বর্ণবণিক সস্ত্রীক বাস করতেন, একদিন রাত্রে মদ খেয়ে এসে পরিবারের পিঠে ও মাথায় তবলা বাজিয়ে বলেছিলেন, বেটি আমি ত সঙ্গৎ কচ্চি তুই একখানা গজল গা দিকি! ত্রিভঙ্গবাবুর আর সহ্য হ'ল না, সেই রাত্রেই মাতাল স্বামীকে হাতে পায়ে বেঁধে নীচের তলায় ফেলে দিলেন আর তার স্ত্রীর হাত ধরে অন্ধকারেই বেরিয়ে গেলেন।"

হরেন্দ্র কহিল, "আপনি বড্ড আধ্যাত্মিক হয়ে উঠছেন, কোথাকার কে ত্রিভঙ্গের কথা এনে ফেললেন!"

"শুধু ত্রিভঙ্গ কেন, বঙ্কিম, বদরুদ্দিন, নৃত্যগোপাল, ভাগ্যধর, শেখ কিনু সকলকার কথাই আজ মনে পড়চে। একটি ক্ষণও যে আনন্দ দিয়েচে তাকে আজ ভুলতে পারচি না!"

"রক্ষা করুন, এঁদের কাউকেই আমি চিনি না। যাদের চিনি তাদের কথা বলুন, যেমন শিবনাথ, অজিত, রাজেন। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেও প্রেমের গল্প শুনতে বড্ড ভালবাসি। আপনাকে আমি ঠকাবো না।"

"পরের প্রেমের কথা শুনে কি আপনার পেট ভরবে, নিজের ব্যবস্থা করেন না কেন?"

হরেন্দ্র চুপি চুপি বলিল, "অক্ষয় যদি আনাচে কানাচে থাকে, শুনতে পেলে আমায় খেয়ে ফেলবে।"

কমল নিজ পৃষ্ঠদেশ দিয়া হরেন্দ্রের পৃষ্ঠ ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "না, খাবে না, আমিই আপনার একটা ব্যবস্থা করি, যদি বলেন।"

হরেন অজিতের মুখে সে রাত্রির ব্যাপার শুনিয়াছিল, ষাঁড়ে ও বলদে যুদ্ধ না বাধিলে অজিতের রক্ষা পাওয়া দুরূহ ছিল। কথাটা

ঘুরাইবার জন্য হরেন্দ্র বলিল, "রাজেনের খবরটা কি বলুন শুনি, কি করে' সে ছোঁড়াটার উপর এত টান হ'ল আপনার ! আরও যে গণ্ডা গণ্ডা ভালো ক্যাণ্ডিডেট আছে, কাকে ছেড়ে কাকে প্রেফারেন্স দেবেন ?"

কমল বলিল, "শুধু মুখে বল্‌লেই ত হয় না হরেনবাবু, কে কেমন ক্যাণ্ডিডেট রীতিমত তাদের নিজেদের এসে যোগ্যতা প্রমাণ করা চাই। তা না হলে আমিই বা কেস্‌গুলো নিয়ে ডিল করি কি করে ? আপনি সবাইকে ব'লবেন কেউ যেন লজ্জা না করে, অকপটে এসে নিজেদের মনের কথা জানায়। এতে লজ্জার কিছু নেই, হরেনবাবু। কামনা করি নরনারীর এই পরিচয়ই যেন একদিন জগতে আলো-বাতাসের মত সহজ হয়ে যায়।"

"আজ আপনার কি যে হয়েছে জানিনে, যা বলচেন সমস্তই দুর্ব্বোধ্য !"

কমল বলিতে যাইতেছিল, "এম্‌নিই হয়", কিন্তু দ্বারের নিকট হইতে কে যেন তাহার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "না, এমনিই হয় না, একজন ক্যাণ্ডিডেট স্বয়ং তার কেস প্রমাণ করতে হাজির।" বিস্মিত হইয়া তাহারা দেখিল, অজিত ঘরে ঢুকিতেছে। হরেন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি অজিত, এমন সময় কোত্থেকে ?"

অজিত কহিল, "কি জানো হরেনদা, জামাটা আমার দু' একদিনের মধ্যেই চাই তোমাকে ব'লতে ভুলে গেছলাম, তাই ভাবলাম একবার ঘুরেই আসি, তা বেরিয়েছি অনেকক্ষণ। পথে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, যেতে দেখি একবারে পাগলা-গারদের সামনে ! মনে মনে কি যে বিড় বিড় করে বকছিলাম তা জানি না, যাই হোক গারদের পাহারা ব্যাটা ভাবলে বোধ করি ভিতর থেকে পালিয়ে

এসেছি। ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিল অনেকক্ষণ, দু' এক ঘা মেরেও দিয়েচে, অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু দক্ষিণা দিয়ে তবে ছাড় পেয়েছি, উঃ পিঠটা বোধ করি ফুলে উঠেছে", এই বলিয়া সে পিঠের জামা তুলিয়া দু' তিন স্থানে সুস্পষ্ট প্রহারের চিহ্ন দেখাইল।

হরেন কহিল, "বিলক্ষণ! এতক্ষণ এঁর সঙ্গে ত তোমারই কথা হচ্ছিল, ভাগ্যে এসে পড়েচ, নইলে রাজেন ছোঁড়াটা প্রায় তোমাকে ডিস্‌পজেস্‌ করেছিল আর একটু হ'লে।"

কমল কহিল, "একবার যে ভুল করে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি, তা যেন আর না ঘটে।" এই বলিয়া সে বাঁহাতের কনুই দিয়া হরেন্দ্রকে একটু ঠেলিয়া দিল। উদ্দেশ্য অজিতের জন্য একটু বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া। অজিত সেই চৌকিটির এক কোণে কোন প্রকারে আশ্রয় লইল। তবে এবার তিনজনে তিন মুখো হইয়া বসিল। খানিকক্ষণ কেহ কোন কথাবার্ত্তা বলিল না, এই ভাবেই কাটিল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কমল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "রাত্রি অনেক হ'ল, এখন একটা বিছানা পেতে দিই, দু'জনে শুয়ে পড়ুন।"

হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, "এই ঘরে? কিন্তু আপনি?"

"আমিও এই খানেই আপনাদের কাছে শোব, আর ত ঘর নেই!"

এ যে কি প্রস্তাব হরেন্দ্র কল্পনাও করিতে পারিল না। তাহার বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া কমল উঠিয়া পড়িল এবং হরেন্দ্রের হাত ধরিয়া তাহাকে দরজার বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল, বলিল, "জানি, এ আপনার কর্ম্ম নয়, আপনার শুধু বদচিন্তাই মাথায় জাগচে। অথচ অজিতবাবুর হাতে এক খানি পাকপ্রণালী অথবা কবিরাজি ওষুধের বিজ্ঞাপন দিলে তাই নিয়ে সারা রাত্রি অনায়াসে কাটিয়ে দেবেন, পাশে

মানুষ শুয়ে আছে কি মোষ শুয়ে আছে একবার ভাবতেও সময় পাবেন না। ওইখানেই মানুষে মানুষে তফাৎ হরেনবাবু, আপনি বরঞ্চ বাড়ী ফিরে যান।” ফিরিয়া সশব্দে হরেনের মুখের উপরই দরজাটা বন্ধ করিয়া কমল খিল আঁটিয়া দিল। হরেন্দ্র কিছুক্ষণ অন্ধকারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সিঁড়ির দরজা কল্পনা করিয়া যেখানটিতে প্রবেশ করিল তাহা একটি গরাদহীন জানালা, নীচেই খোলার চাল এবং তন্নিম্নে সরকারি রাস্তা। হরেন লাফাইয়া খোলার চালের উপর পড়িয়া গেল, সেখান হইতে হাঁকিয়া বলিল, “আলোটি ধর হে অজিত, হাড়গোড় সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।” অজিত উঠিবার উপক্রম করিতেই কমল তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “তুমি যেতে পাবে না, কেমন যাওত দেখি!” অজিত অসহায়ভাবে বসিয়া রহিল, হরেন্দ্র খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান করিল, প্রদীপের স্বল্পালোকে অজিতের দিকে কমলের দুই চক্ষু দু’টি বিড়ির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। অজিত অল্পকাল চুপচাপ থাকিয়া বলিল, “কিছু খেয়ে আসা হয়নি, দু’টে ভাতেভাত ফুটিয়ে দিতে পারেন?”

কমল শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বক্রোক্তি করিল, “গোঁসাইজীর জাত যাবে না?”

“দুৎ, আপনি ভারী দুষ্টু!”

“কেন দুষ্টু কিসের! এই সেদিন গাড়ীর মধ্যে চেপে ধরে বললেন, কমল, তুমি রাজি? আমি বললাম “আমিই কি গররাজি! সে কথা যাক্, আমি ত আর বোষ্টমী নই যে পাকা জাত-বোষ্টমের পাতে ভাত দেব!”

অজিত হঠাৎ অস্বাভাবিক আগ্রহের সহিত বলিল, “হতে পারেন না কি কোন দিন? সত্যি বলুন না, হতে পারেন না—যা বললেন?”

"বলেছিলেন কি কখনও?" বলিতে বলিতে কমলের কণ্ঠস্বর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, "কোনদিন বলেছিলেন কি যে কমল তুমি বোষ্টমী হবে? হই কি না হই দেখতেন! বরং পূর্ব্বে ডাকতেন তুমি বলে, এখন বলচেন 'আপনি', কি অপরাধ করেচি আমি?"

উদ্যত অশ্রু গোপন করিবার জন্যও বটে, তাছাড়া দরকার বলিয়াও বটে, কমল ষ্টোভটা জ্বালিয়া কি একটা তাহাতে চড়াইয়া দিয়া বলিল, "লোকের মুখে শুনি আপনার কত টাকা! কিন্তু এ ক'দিন একরকম আধপেটা খেয়েই রয়েছি, কারো হাতে দু'চার আনা পাঠিয়ে দিয়েচেন কি?" তারপর কি একটা নামাইয়া আবার কি একটা ষ্টোভে চড়াইয়া বলিতে লাগিল, "একটা হাত ত গেছে, আর একটাই বা যেতে কতক্ষণ! শেষে কি না খেতে পেয়ে মারা পড়ব? রাজরাণী হওয়া যার সাজে তার এই উঞ্ছবৃত্তি আর সকলে দেখুক, আপনি দেখছেন কি করে?"

এ প্রশ্নের জবাব আসিল না, বোধ করি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই। কিই বা রান্না! উচ্ছেভাতে ভাত শেষ হইতে বিলম্ব হইল না। আহারান্তে কমল অজিতকে প্রশ্ন করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আশ্রমে ঢুকতে আপনাকে যুক্তি দিলে কে?"

"হরেনদা। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সমাজ না হলে রক্ষা হয় কি করে? আমাদের মত ব্রহ্মচারী, ব্রতধারী নিষ্কলুষ যুবকেরা..." কমল হঠাৎ তাহার আঁচলটা অজিতের উচ্ছিষ্ট মুখেই গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "চুপ চুপ, হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ুন, আর না।"

"কিন্তু আমাকে ত আশ্রমে ফিরে যেতে হবে এখুনি, ব্রহ্মচারীদের বাইরে থাকা নিষেধ।"

"না হবে না। আজ এখানেই শুতে হবে। অনেক কথা আছে।"

"কিন্তু তুমি খাবে না ?"

"আমার প্রথম স্বামী মরবার পর থেকে কি দু'বেলা খাই যে আজ খাব ?"

অজিত আর কথা বলিল না। হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া কমলের স্বহস্তরচিত শয্যার উপর বসিয়া দেখিল বালিশের ওয়াড়ে একটি উড়ন্ত হাঁস আঁকা রহিয়াছে। নিবিষ্ট চিত্তে তাহাই দেখিয়া একটি অজ্ঞাত প্রীতিরসে তাহার চিত্ত সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় থালাবাটি ধুইয়া কমল ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি দেখছেন ? ওই কাজটুকু ! ও শুধু আপনার জন্যেই করেছিলাম। না না, অপর কেহ যে বিছানায় শুয়েছে, তা আপনাকে দিতে পারি না। এ শুধু আপনি আসবেন বলে ; যে দিন তাজমহলের সমুখে প্রথম দেখা হয়, ভেবেছিলাম, আসবেনই একদিন, তাই রাত জেগে ঐ কাজটুকু করেছিলাম। শিবনাথ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ; আমি বলেছিলাম, এ তাঁরই জন্য, কিন্তু মাইরি বলচি, শিবনাথের পুরোনো পিরীতের জন্য আমার বয়ে গেছল রাত জাগতে।"

অজিত কথা কহিল না, শুধু একটা বেগুনে আভা তাহার মুখের উপরে দেখা দিয়া চক্ষের নিমিষে নিভিয়া গেল। কমল বলিল, "কথা কইছেন না যে ?"

"না।"

"তার কারণ ?

"কারণ, যেমন শিবনাথকে লুকিয়ে আমার জন্য হাঁসটি এঁকেছ, আমাকে লুকিয়ে হয় ত আবার কারও জন্য একটি বক আঁকবে !"

"সেটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আজকের ওই হাঁস আঁকাও যেমনি

সত্যি, সেদিনকার বক আঁকাও তেমনি সত্যি হবে। যতদিন কাছে থাকব, ঐ শিক্ষাটিই দিয়ে যাব।"

অজিত বলিতে যাইতেছিল, "শুধু বক কেন, হয় ত কত পাখীই আঁকতে হবে, শেষে চামচিকাটি পর্য্যন্ত," কিন্তু কমল বাধা দিয়া বলিল, "কামনা করি, নরনারীর এই পরিচয়টাই জলের মত স্বচ্ছ, বাতাসের মত হাল্কা এবং তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাক।"

অজিত নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল। কথা কহিল না। তবে গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকার জন্য তাহার মুখটা কতকটা পেঁচার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া কমল ভাবিতেছিল, না জানি ইহা কোন্ ভবিষ্য দিনের সূচিকর্ম্মের সূচনা করিতেছে। সেও কোন কথা বলিল না, শুধু ধীরে ধীরে অজিতের মাথায় আঙুল চালাইতে লাগিল। তাহাতে আরাম পাইয়া অজিত কতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু কমল তাহার চুল ধরিয়া টানিতেই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

কমল বলিল, "শেষ পহরের মুর্গী ডাকছে। ভোর হল বোধ করি।"

"হুঁ, আর ঘুমোবার সময় নেই, বোধ করি উঠে পড়াই ভাল।"

১৬

আশুবাবুর দৃঢ় ধারণা ছিল যে মানুষের জীবনে সুখদুঃখগুলো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত, কোন মূল্যই নাই, একেবারে নিরর্থক। তাই টাইফয়েড রোগে ভুগিলেও তিনি দুঃখিত হইতেন না, আবার

মুসৌরী পাহাড়ে বসিয়া গল্‌দা চিংড়ীর কাট্‌লেট খাইয়াও প্রীত হইতেন না, ভাবিতেন ও তুইএ বিশেষ তফাৎ নাই, মূলতঃ একই জিনিষ। তিনি যখন বাতের বেদনায় তাঁহার সেই আরাম-চেয়ারটায় একটি বৃক্ষকাণ্ডের মত পড়িয়া থাকিতেন আর দেখিতেন তাঁহারই চতুর্দ্দিকে আরস্থলার দল ফর্‌ফর্‌ করিয়া উড়িতেছে, তখন মনে করিতেন, এ আর বিশেষ কি? তিনিও হয়ত কখনও আরস্থলা হইয়া উড়িতে পারেন, আর ঐ উড্ডীয়মান আরস্থলাও যে কখনও বাতে আক্রান্ত হইবে না তাহাই বা কে বলিল! বস্তুতঃ এরূপ একটি সাম্যের ভাব সহজাত সংস্কারের ন্যায় সদাই তাঁহার অন্তরে বিরাজ করিত, সর্ব্বদাই কে যেন কানে কানে বলিত, এমনিই হয়! কিন্তু কয়দিন যাবৎ একটি অহেতুক অশান্তি তাঁহার চিত্তে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল, কি জন্য তাহা সঠিক বলা যায় না। অকারণে চাকরবাকরকে বলিতেছিলেন, "শালার বেটা"; সেদিন মুচিটা তাঁহার জুতা মেরামত করিয়া আনিলে তদ্দ্বারা তাহারই পৃষ্ঠে দু'ঘা বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "বেইমান, উল্লুকা বাচ্ছা কাঁহাকা"; সন্ধ্যার সময় চাকরাণীটা তাঁহার কোমরে বাতের তেল মালিশ করিতে আসিলে সেই তেল খানিকটা তাহার চালিয়া দিলেন। বন্ধুবর্গ ওসব তাঁহার রোগের সিম্‌টম মনে করিয়া উচ্চবাচ্য করিতেন না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি বুঝিতে হইলে একটি ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহা এই।

কয়েক দিন হইতে নীলিমা আশুবাবুর ঘরে আসিয়া একেবারে গৃহিণীর আসনটিতে অভিষিক্ত হইয়া বসিয়াছিল। অবিনাশবাবুর সহিত তাহার চটাচটি হইয়া শেষে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে। ইহা সম্ভব হইল অবশ্য সামান্য কারণেই। সামান্যই বা বলি কি করিয়া, সামান্যই অসামান্য, আবার অসামান্যই যে সামান্য তাহা

কে অস্বীকার করিবে! নীলিমা কমলকে তাহার জীবনের আদর্শ স্থির করিয়া কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কেবলই তাহার ক্রিয়াকলাপের অনুকরণের চেষ্টা করিতেছিল। ইহা অবশ্য অনেকটাই অজ্ঞানতঃ। অবিনাশ প্রথমটা লক্ষ্য করেন নাই, যখন করিলেন তখন, কেসটি সম্পূর্ণ ডেভেলপ করিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নিকট ব্যাপারটি বড় বেসুরো লাগিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি মাত্র একটি যন্ত্রের ন্যায়, নীলিমা সুর হইয়া যেন তাঁহার জীবনটি জুড়িয়া ছিল। আজ কমলের ন্যায় যন্ত্রী আসিয়া বর্জ্জিত সুরগুলাই বার বার আঘাত করিতে লাগিল, আর অবিনাশ দেখিলেন তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে, পাশ্চাত্যের সঙ্গীত যে আমাদের রাগ-রাগিণীর বিজ্ঞানমতে যেগুলি বদ্‌সুর, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় ইহা অবিনাশ বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে তিনি বেড়াইয়া ফিরিবার সময় একপোয়া রাবড়ী খরিদ করিয়া আনেন, অর্দ্ধেকটি নিজে খাইয়া বাকীটুকু নীলিমার জন্য রাখিয়া দেন। পরের দিন সকালে উঠিয়া দেখেন যে নীলিমা বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাসিমুখেই রাবড়ীটুকু খাইতেছে। অর্থাৎ রাত্রে তাহা স্পর্শ করে নাই। কমলও ঠিক এইরূপ করিত, রাত্রে কোন খাদ্যদ্রব্য পাইলে তাহা প্রাণান্তেও ভক্ষণ করিত না, বরং ভোরে উঠিয়া বাসিমুখে তাহার সদ্ব্যবহার করিত। অবিনাশবাবুর আর ব্যাপারটি বুঝিতে বাকী রহিল না। তারপর আর একদিন দেখেন নীলিমা আরসির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাসিকার অগ্রভাগটি তর্জ্জনী দ্বারা বার বার টিপিয়া ধরিতেছে; পিছন হইতে আয়নায় তাহা দেখিতে পাইয়া অবিনাশ বলিলেন, "দেখ কমলের নাকটা অস্বাভাবিক উঁচু বলেই সে অমন করে, তোমার দরকার কি ওরূপ করবার?"

নীলিমা সর্পদষ্টের ন্যায় ফিরিয়া তীব্রস্বরে বলিয়াছিল, "কমলকে

নিয়ে আপনাদের টানাটানি কেন, আর কি উপমা দেবার লোক পান না? তার কথা থাক্।" বাস্তবিক জীবনে যাহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা, বিশেষ করিয়া এই ভগ্নদন্ত অকালবৃদ্ধের পক্ষে নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া তাহার বোধ হইল। এইরূপ দুই কথায় এক কথায় ক্রমশঃ বিরোধ বাধিতেছিল। তারপর আজকাল অবিনাশও একটু বেচাল হইয়া পড়িয়াছিলেন। একটি অল্পবয়স্কা হিন্দুস্থানী পরিচারিকা প্রত্যহ বাসায় কাজ করিতে আসিত, অবিনাশ তাহার প্রতি একটু অধিক মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন নীলিমা স্বচক্ষে দেখিল তিনি প্রাতঃকালে জলখাবারের পাত্র হইতে একখানা জিলিপী স্বয়ং হাতে করিয়া সেই ঝি-টিকে খাওয়াইলেন। সে অবশ্য মনিব বলিয়া প্রথমটা আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু অবিনাশবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা ঝি-টি জিলিপীখানি মুখে করিয়া ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল। কমলের শিক্ষা বৃথা হইল না। অবিনাশবাবুর জীবনে ইহা একটি নূতন প্রেমের সূর্য্যোদয় কল্পনা করিয়া নীলিমা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে দূর হইতে ইহাকেই নমস্কার করিয়া এইরূপ একটি চিঠি অবিনাশবাবুর উদ্দেশে লিখিয়া রাখিয়া পথে বাহির হইল,—"মুকুজ্জে মশায়, আমাদের প্রেমের সূর্য্য অস্ত গেছে, হাজার কান্নাকাটিতেও সে আর ফিরবে না, অতএব পশ্চিম দিকে তাকিয়ে রাত কাটানো দু'জনেরই বোকামি হবে। আপনি অবশ্য এখনই আলোর মুখ দেখতে পেয়েছেন, যাবার সময় এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমারও জীবনের পূর্ব্বাকাশ এম্‌নি করেই রাঙিয়ে ওঠে।"

পথে বাহির হইয়া সে সোজা পূর্ব্বদিকেই চলিয়া গেল, একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিল না। পূর্ব্বদিকে কিছুদূর

গেলেই আশুবাবুর বাটী, সেখানে যাইয়া দেখিল আশুবাবু সেই আরাম-চেয়ারটায় একপেশে হইয়া পড়িয়া আছেন। নীলিমার মনে হইল, সে যেন গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে,—নিতান্ত ভুল সে করে নাই, সেই কথাই আজ সংক্ষেপে বলিব।

অজিত সেদিন সন্ধ্যায় একটি ইংরেজী গল্পের বই হাতে করিয়া আশুবাবুর গৃহে উপস্থিত হইল, সঙ্গে হরেন্দ্র। গল্পটি তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে, তাই আশুবাবু ও নীলিমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। মুষলধারে জল পড়িতেছিল, তাহা গ্রাহ্য করে নাই। হরেন্দ্রও স্বেচ্ছায় আসিয়াছিল, কেন, বর্ষার সন্ধ্যাটা বেকার ঘরে বসিয়া মশা চাপ্ড়াইবে তাই দু'টা গল্পগুজব করিয়া আসাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। দুইজনে একেবারে ভূতের ন্যায় ভিজিয়া যখন আশুবাবুর বাসায় পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। সিক্ত বসনে আশুবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া উভয়ে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, "বৌদি কোথায়?"

কাপড়ের ভাঁজ হইতে বইখানি সযত্নে বাহির করিয়া অজিত তাহা এরূপ ভাবে টেবিলের উপর রাখিল, আশুবাবু ভাবিলেন সে বুঝি তাহার বৌদির জন্য একটি অমূল্য উপহার আনয়ন করিয়াছে। চুরুটটা মুখে চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে আশুবাবু বলিলেন, "ওটা কি?" আবার উভয়ে কহিল, "বলচি, বৌদি কোথায়?"

"তোমাদের খবর ভাল ত?"

"বলচি, বৌদি কোথায়?"

"এত জলে ভিজে আসার কারণ?"

"বলচি, বৌদি কোথায়?"

উত্তরের প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইল না। নীলিমা প্রবেশ করিল—তাহার হাতে সন্ধ্যাদীপ, বগলে দুইটি শুকনো কাপড়। কোন কথা না বলিয়া সে পূর্ব্বদিকের জানালাটি খুলিয়া দিল, প্রদীপটা তুলিয়া ধরিয়া বর্ষার অন্ধকারে আকাশের দিকে খানিকক্ষণ নিবিষ্ট ভাবে কি দেখিল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং অস্বাভাবিক, যেন বিশ্ববস্তুর অন্তস্তল ভেদ করিয়া সুগভীর অন্বেষণে ব্যাপৃত, বোধ করি দেখিতে চাহে কখন পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের আভাস দেখা দিবে—তার পর প্রদীপটা মাটিতে রাখিয়া জানালার উপর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, ইত্যবসরে অজিত তাহার পিছন হইতে বগলের কাপড় দুইটি টানিয়া লইল। কেহ কোন কথা বলিল না, বলিবার কিইবা ছিল! নীলিমা প্রণাম করিয়া উঠিতে হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক দু'টি শুক্‌নো কাপড় আমাদের দরকার কেমন করে বুঝলেন বলুন ত, গুণতে জানেন নাকি?"

নীলিমা কহিল, "না গুণবার দরকার হয়নি ঠাকুরপো।" আশুবাবুকে দেখাইয়া বলিল, "ও ঘরে ওঁর বাসনের সিন্দুকটার উপর প্রদীপটি রেখে যেমন গড় করব মনে করেচি, অমনি যেন বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল, সিন্দুকের মধ্যে থেকে কে যেন বললে—যাবার সময় দু'টো শুক্‌নো কাপড় নিয়ে যেয়ো, থান ধুতি নয় পাড়ওয়ালা, তা শাড়ী হ'লেও চলবে।" বস্তুতঃ কাপড় দু'টিই নীলিমার, চওড়া পাড় শাড়ী বিশেষ। পূর্ব্বে সে এসব পরিত না, আশুবাবুর এখানে আসিয়া প্রায় উভয়ের কাপড় গোলমাল হইয়া যাইত; তাই বাধ্য হইয়া শাড়ীই পরিতে হইয়াছে।

অজিত কহিল, "বৌদি বসুন, একটা অতি চমৎকার গল্প আজ পড়লাম, আপনাকে শোনাব বলে' বইটা এনেচি।"

"এই যে শুনি ভাই", বলিয়া ত্রস্তচরণে নীলিমা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিল এক পেয়ালা দুধ হাতে করিয়া। প্রথমটা চা মনে করিয়া অজিত কাপটি ধরিতে যাইতেছিল, হরেন্দ্র ইসারা দ্বারা তাহাকে নিবৃত্ত করিল। নীলিমা আশুবাবুর পাশে একটি টুল টানিয়া লইয়া বসিয়া কহিল, "খেয়ে নিন, এইটুকখানি দুধ, ফেলা চলবে না। ডাক্তারের ব্যবস্থা আমি ভাঙতে দেবো না, বরং দরকার হয়ত লণ্ঠনের মাথায় কাপটা বসিয়ে আর একবার গরম করে দিচ্ছি।"

আশুবাবু অবসন্নভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ডাক্তারের ব্যবস্থা ত বটে, কিন্তু এই বুড়োবয়সে কি আর তেমন হজম শক্তি আছে যে ব্যবস্থা মেনে চলব। একদিন ছিল বটে, যখন আফিং খাওয়াটা প্রথম অভ্যাস করি, পাঁচটি সের মারা দুধ না হলে আশু-বদ্যির চলত না। আর তার জন্য ভাবতেও কি হয়েছে একটা দিন! দুটি বেলাই ভাত খাবার পর একটি বড় কড়ায় করে সের আড়াই দুধ নিয়ে আসতেন নিজে, কড়াটি আমার মুখে ধরতেন, আমি চুমুক দিয়ে খেতাম", বলিয়া সম্মুখস্থ দেয়ালে বিলম্বিত তাঁহার স্ত্রীর ফোটোটির দিকে চাহিয়া হস্তস্থিত চুরুটটি একবার মাথায় ঠেকাইলেন। অজিত ও হরেন্দ্র বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, ইহার যে এক বিন্দু মিথ্যা নয়, এই বৃদ্ধটি যাহা বলেন তাহা সত্যই বলেন, যাহা বলেন না তাহা সত্যই বলেন না, ইহা তাহারা জানিত। নীলিমা কিন্তু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল, "কি আর আপনার বয়স হয়েছে এমন যে বয়সের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন! এখনো মনে করলে কি পাঁচ সের দুধ চুমুক দিয়ে খেতে পারেন না, খুবই পারেন। আপাততঃ এটুকু ত খেয়ে নিন, তার পর আমরা অজিত ঠাকুরপোর গল্পটা শুনব, কেমন? পারেন ত?" সে নিজেই কাপটি আশুবাবুর মুখে ধরিল, আশুবাবু রহিয়া রহিয়া তাহাকে

বৃদ্ধাটি রাজী হইলেন।

অজিত এইখানে খানিকক্ষণ চুপ করিল, বোধ করি, দম লইবার জন্য। নীলিমা কহিল, "সুন্দর! কথাগুলি আমার ভারী সুন্দর লাগল, ঠাকুরপো।"

আশুবাবু বলিলেন, "তার পর, অজিত, তার পর?"

অজিত পড়িতে লাগিল তার পর সেদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধাটি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই কথাই ভাবিতেছিলেন, সবই আছে, সেই দাঁত, সেই চুল, আজও ড্রেসিং-টেবিলের উপর প্রস্তুত আছে, অথচ কি যেন ছিল, আজ তাহা নাই।

আশুবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "কিছুই যায় নি অজিত, গেছে শুধু তাঁর মা হবার শক্তিটুকু হারিয়ে।"

হরেন্দ্র কহিল, "তা হোক্, তবু যেন গল্পটায় একটু বাড়াবাড়ি করেছে।" নীলিমা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এর একটুও বাড়াবাড়ি নয়, এ কথা আর যেই ভুলে যাক, মেয়েদের ভুললে চল্‌বে না।"

সহসা দ্বারপ্রান্ত হইতে কমলের স্বর শুনা গেল, "যে সব চাটুকার একদিন প্রচার করেছিল মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারীজাতিকেই তারা বঞ্চনা করেছিল। জীবনে যে কোন অবস্থাই স্বীকার করুন দিদি, এই মিথ্যা নীতিটাকে কখনও যেন মেনে নেবেন না। মা হওয়ার মধ্যে কোন কৃতিত্বই নেই, ওটা ধাপ্পাবাজী বই আর কিছুই নয়।"

কি আশ্চর্য্য! সে কখন আসিল? গল্পের সবটাই যে সে শুনিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, অথচ এতক্ষণ কেহ লক্ষ্য করে নাই—তাই তাহার প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরও কাহারো মুখে যোগাইল না। কমল পুনরায় বলিল, নীলিমাকেই লক্ষ্য করিয়া, "এই মোহেই এতদিন

পুরুষ নারীকে অন্ধ করে রেখেছিল। আজ আর তা চলবে না, পচা গরুর দড়ির মত ও বাঁধন ছিঁড়ে যাবে। গল্পের ওই বৃদ্ধার এখনও হয়ত আশা আছে, কিন্তু যদি একপাল নাতিনাতনি থাকত, কি উপায় হ'ত বলুন দেখি!"

অজিত বিস্মিত হইয়া কহিল, "গল্পটা তুমি পড়েচ নাকি? সত্য সত্যই সেদিন প্রীতিভোজের রাত্রে বৃদ্ধা নার্স'টি ওই রোগা ডাক্তারের একজন আশী বছরের বৃদ্ধ খুল্লতাতের সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড্‌ হয়েছিলেন। সেটা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি আনন্দপ্রদ ব্যাপার।"

কমল বলিল, "পড়বার দরকার নেই অজিতবাবু, এমনিই হয়। কিন্তু রাত্রি হ'ল কাকাবাবু, আমি যাই।"

কাকাবাবু অবশ্য অজিত নয়, আশুবাবু। সে সত্যই চলিয়া যায় দেখিয়া আশুবাবু ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "যেয়োনা শিবু, আর একটু বসে যাও।"

ইত্যবসরে নীলিমা এক অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিল। ক্লডিয়াসের চিত্তে পাপ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য হ্যামলেট একটি মূক অভিনয় সংঘটিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ফলও ফলিয়াছিল। অজিতের গল্পটি সেরূপ কোন উদ্দেশ্য লইয়া পঠিত না হইলেও নীলিমার পক্ষে পরিণামটা দাঁড়াইল তদ্রূপ। সে আশুবাবুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একেবারে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে সুরু করিল। কাছে হাতপাখা নাই, আশুবাবুর ইঙ্গিতে অজিত সেই গল্পের বইটি তাঁর হাতে দিল, তিনি তাহার দ্বারাই নীলিমাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। কমল বিস্ময়ে দুই কর যুক্ত করিয়া নমস্কার করিল, বুঝিল, ইহা নবীন *সূর্যোদয় অথবা শ্রান্ত রবির অস্তগমন*—এ জিজ্ঞাসা বৃথা, আরক্ত আভায় আকাশের যে দিকটা আজ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বপশ্চিম

দিক নির্ণয় না করিয়াই সে ইহারই উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিল, বোধ করি, আরও অনেকক্ষণ কাটিত। কিন্তু ঘরটায় অত্যন্ত মশার উৎপাত, হরেন্দ্র কতকটা মরিয়া হইয়া বলিল, "নাঃ, এইবার ওঠা যাক, ঘরটায় বড্ড মশা।" নীলিমা তখনই বিদ্যুৎগতিতে আশুবাবুর কোল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, হরেন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "হরেন ঠাকুরপো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলো, যদি না যাও তবে কাল বলো না কে আমায় বলেন নি কেন!"

কমল পুনর্বার যুক্ত করে নমস্কার করিয়া আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "যে ক্ষণটির জন্য নীলিমার স্পর্শসুখ পেয়েছেন তাকে কখনও জীবনে মিথ্যা মনে করবেন না, কাকাবাবু। তার আয়ু যদিও এখনি ফুরলো তথাপি এর চেয়ে অতি বড় সত্য আর নেই। আজ এও যেমনি সত্য, কাল যদি ওঁর হাতের সাজা পান খেয়ে হরেনবাবুর মুখটা খুসী হয়, সেও তেমনি সত্য হবে।"

নীলিমা কান্নার সুরে বলিল, "পশ্চিমের দরজা খুলে সূর্য্যোদয় দেখার চেষ্টা বৃথা হবে, কমল এ আলোচনা থাক।"

হরেন্দ্র অসহায় ভাবে বলিল, "তবে একটা গাড়ী ডাকিয়ে চারজনেই যাওয়া যাক।"

অজিত কহিল, "অগত্যা।"

কিন্তু কমল অগ্রসর হইয়া অজিতের হাত ধরিল, কহিল, "না, বরং আমরা হেঁটে যাচ্ছি, আপনারা একটা রিকৃস অথবা একায় চড়ে যান।"

সিঁড়িতে নীলিমা হরেন্দ্রের বাহুতে দেহলতার ভার ন্যস্ত করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "ওকে চেঁচিয়ে বলে যাও ঠাকুরপো, রান্নাঘরে এক কড়া দুধ আছে যেন বেরালে না খায়।"

অজিত ভাবিতেছিল, কি আশ্চর্য্য! সে শুনিয়াছিল, একজন ধীবর নদীতে মাছ ধরিবার সময় কুমীরে তাহাকে আক্রমণ করিলে সে তাড়াতাড়ি পরিধানের বস্ত্রখানি খুলিয়া তীরস্থ শিশুপুত্রের গায়ে ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল, মেধো, কাপড়টা তোর মাকে দিস্। পুত্রের নাম ছিল মাধব। বস্তুতঃ নারীজাতির স্নেহও সেইরূপ অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত! যাইবার প্রাক্কালেও নীলিমা বলিতে ভুলিল না যে রান্নাঘরে কড়ায় দুধ আছে, সেটিকে সাবধানে রক্ষা করা প্রয়োজন! সত্যই ত বেরালে দুধ খাইয়া গেলে অত রাত্রে আর কি পাওয়া যাইবে?

কথাটা আশুবাবুর কানে গিয়াছিল, তিনি ভৃত্যের অপেক্ষায় চোখের উপর হাত চাপা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

১৭

আরও কিছুদিন গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েক দিবস কমল আগ্রা সহর হইতে কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। সকলে আঁতিপাতি করিয়া খুঁজিয়াছে। হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছেলেরা মথুরায় গিয়াছিল কীর্ত্তন গাহিতে, সে টেলিগ্রাফ করিয়া তাহাদিগকে আনাইয়া এক একটি ব্যাচ্ ফরম্ করিয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছে। কিন্তু প্রত্যহ খবর আসিতেছে কমলের খোঁজ নাই। অজিত হরেন্দ্রের আশ্রম ছাড়িয়া কমলের সেই পোড়ো বাড়ীটাতেই এক গাদা মালপত্র লইয়া ঢুকিয়াছে, তাহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে কমল নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে, কারণ, রান্নাঘরে হাঁড়ি খুলিয়া

সে দেখিয়াছে, তাহাতে পান্তাভাত সরাচাপা দেওয়া রহিয়াছে। অজিত জানিত ইহা কমলের বড়ই প্রিয়, যতই উহা পচিয়া কটু আস্বাদ হইবে ততই কমল উহাকে অধিকতর যত্নের সহিত লঙ্কা মাখিয়া খাইবে। যথার্থই দশ বার দিন পরে কমল আসিল, আশ্রমের দুইটি ঘুঘু-ছোকরা তাহাকে টুন্‌ড্‌লায় খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে এবং একেবারে বামাল সমেত হাজির হইয়াছে। ব্যাপারটি অতি সামান্য। কমলের বাবার পরিচিত একটি ট্যাঁস সাহেব সেখানে রেলের টি-টি-আই। তাঁহার স্ত্রীটি হঠাৎ একটি মান্দ্রাজী সাহেবের সহিত ফেরার হইয়া যাওয়ায় ট্যাঁস বেচারী এক গাদা কাচ্চাবাচ্চা লইয়া বিষম বিপদে পড়েন। কিন্তু দৈবের এমনই যোগাযোগ যে সে লোকপরম্পরায় জানিতে পারে কমল অতি সন্নিকটেই রহিয়াছে। আসামের চা-বাগানে কমলের বাল্যকালে ফিরিঙ্গি সাহেবটি তাহার মাতার কুটিরে বার কয়েক যাতায়াত করিয়াছিলেন, তাহার পিতারই মুসাবিদায়। সেই পরিচয়। কমল সংবাদ পাইয়াই তৎক্ষণাৎ টুন্‌ড্‌লায় যাইয়া ট্যাঁস বেচারীর সংসারটি এমন সুচারুভাবে গুছাইয়া দেয় যে মান্দ্রাজী সাহেবের সহিত তাঁহার স্ত্রীর আচরণটা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন। বস্তুতঃ তাঁহার স্ত্রী ছিল বা ছিল না এ প্রশ্ন আর তাঁহার মনেই জাগে নাই। তাঁহার জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ অবধি সমস্তই কমল করিতেছিল। আশ্রমের ছোকরা দুটি যাইয়া দেখে, সে সাহেবের জুতা বুরুস করিতে ব্যাপৃত, তখনই আবার সাহেবের পকেট হইতে পয়সা লইয়া মদওয়ালার বিল চুকাইয়া দিল। সাহেব নাইট ডিউটি সারিয়া আসিয়া একটি আরাম-চেয়ারে পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন, মুখে একমুখ দাড়ি। কমল তখনই শেভিং বক্স বাহির করিয়া ঘুমন্ত সাহেবকে অতি সাবধানে কামাইয়া দিল। তিনি জাগিয়া উঠিলে পাছে তাহাকে আসিতে

না দেন তাই সে তাড়াতাড়ি একটি ডিম সিদ্ধ করিয়া একটি প্লেটে করিয়া নিদ্রিত টাঁস ভদ্রলোকটির চেয়ারের হাতলে রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, খোসাটি পর্য্যন্ত ছাড়াইবার সময় পায় নাই। নিঃশব্দে প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে পায়ের চটি জুতাটি খুলিয়া বগলে পুরিয়া এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে পথে বাহির হইয়াছিল, যে নাই বা হইল ডিম্বের ত্বক্ উন্মোচন করা, এজগতে কত লোক কত ডিমেরই বা খোসা ছাড়াইবার সময় পাইয়াছে!

বাসায় পৌছিয়াই সে অজিতের সহিত বাক্য বিনিময় না করিয়া একটি কাগজে তাহার মালপত্রের হিসাব টুকিতে লাগিল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সেগুলি পড়িয়া ছিল, তাহাদের তদারক সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অজিত পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, কমল কোন আইটেম ছাড়িয়া যায় কিনা। কিন্তু কমল সবই টুকিল, অজিতের চোখ উঠিয়াছিল কিছুদিন পূর্ব্বে, তাহার আই-লোশনের খালি শিশি কয়টি—তাহাও নোট করিল, ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা ট্যাব্লয়েডের শূন্য কৌটা দুইটি তাহাও বাদ রাখিল না। টুন্‌ডলায় যাইয়া কমল টাঁস ভদ্রলোকটিরও একটি মালপত্রের লিষ্ট তৈয়ার করিয়াছিল, তাহার ডুপ্লিকেটটি এখনো তাহার পকেটেই ছিল। সে বলিত, কোথায় কি আছে, না হলে খুঁজে পাব কি ক'রে? শেষে কি চিনি বার করতে জুতোর বাক্‌স খুলব। বস্তুতঃই ইহাতে কাজেরও বড়ই সুবিধা হয়। সে অবসর পাইলেই লিষ্টখানি নির্জ্জনে বসিয়া পড়িত, দু'চার দিন এরূপ করিলেই প্রায় তাহার মুখস্থ হইয়া যাইত। ঘরে ঢুকিয়াই আপন মনে বলিতে সুরু করিত, দু' জোড়া চটি, তিন জোড়া বুট, একটা নাগরা, পা-পোষ তিনটি, ঝাড়ন পাঁচখানা, তার মধ্যে দুটো ভাল তিনটা ছেঁড়া, ইত্যাদি।

অজিত ও কমল আগ্রা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, দুই এক দিনের মধ্যেই। কোথায় যাইতেছে, তাহাই সকলের সমস্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ অজিত সত্যই তাহা জানিত না। সে মনে করিয়াছিল, ষ্টেশনে যাইয়া কমলকে জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে কোথাকার টিকিট ক্রয় করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে জানিবারই বা তাহার প্রয়োজন কি? তবে কমলকে যে-কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিত তাহাদের গন্তব্য স্থান কলম্বো। সেখানে অজিতের পিতা নারিকেলের ব্যবসায় করিতেন। অত্যন্ত বুদ্ধভক্ত ছিলেন তজ্জন্য কলম্বোতেই কারবার করিতেন। সেখানে তাঁর একটি নারিকেলের গুদাম আছে, উভয়ে আপাততঃ তাহারই মধ্যেই আশ্রয় লইবে। তারপর দেখিয়া শুনিয়া ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের কোনো একটিতে যাইয়া তাহারা তুঁতের চাষ আরম্ভ করিবে। ওদিকের আমদানি রপ্তানির বিষয় কমল সবিশেষ জানিত। তাহার বাবা তাহাকে সবই শিখাইয়া গিয়াছিলেন, শুধু সেই বিদ্যা ভাঙাইয়া খাইতে পারিলে কেবল অজিত কেন অনেক লোকেরই পুরুষানুক্রমে চলিয়া যাইতে পারিবে, ইহা কমলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

আশুবাবুও স্থির করিয়াছিলেন জীবনের শেষ কয়টা দিন বাসদেও ভৃত্যের একটি বৃদ্ধা পিসিকে লইয়া মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত কোন নিরাপদ স্থানে নির্ব্বিঘ্নে কাটাইয়া দিবেন। কামস্কাট্‌কায় এক চীনা চামড়ার ব্যবসায়ীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, আপাততঃ তাহারই আশ্রয়ে যাইয়া উঠিবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

ইহাদের সকলকে বিদায়ভোজ দিবার জন্য হরেন্দ্র একদিন রীতিমত আয়োজন করিল। সেই ভোজে সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্নী মালিনী, অক্ষয় অবিনাশ প্রভৃতি সকলেই। অনেক রাত্রি হইল, অথচ কমল আসিল না দেখিয়া সেদিন সন্ধ্যায় কাহারো মনে স্ফূর্ত্তি ছিল না। যে যাহার জায়গায় বসিয়া সন্ধ্যা হইতে চুপচাপ কড়িকাঠ গুণিতেছিলেন, মশা চাপড়ান ব্যতীত দ্বিতীয় কর্ম্ম ছিল না। কমল যদি আসিয়া পড়ে ইতিমধ্যে এই আশায় মাঝখানে একটি জায়গা ফাঁক রাখিয়া সকলে গোলাকার হইয়া খাইতে বসিলেন। কমল অবশেষে সত্যই আসিল, তাহার হাতে একটি টিফিনকেরিয়ার। নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে বসিয়া কেরিয়ার হইতে ভাতের পাত্রটি বাহির করিল, একটি কাগজের মোড়ক হইতে শর্করা সংযোগে একটি পেঁয়াজ মাঝে মাঝে কামড়াইয়া খাইতে লাগিল, তরকারিপত্রাদি কিছুই নাই। সে ত আর নিমন্ত্রণবাড়ীর কোন খাদ্যই স্পর্শ করিবে না! ইহা সকলেই জানিতেন, তাই কেহ কোন অনুরোধ, অভিমান ইত্যাদির বাহুল্য প্রকাশ করিলেন না, যে যাহার খাইয়া যাইতে লাগিলেন, বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিলেন না। তথাপি কতটুকুই বা! কিন্তু মনে হইল যেন কমল রূপে রসে, গন্ধে গৌরবে স্বকায় মহিমার একটি স্বচ্ছন্দ আলো সকল জিনিষেই ছড়াইয়া দিল। যেন বর্ষার বন্যলতা! পরের প্রয়োজন মানে নাই, আপন প্রয়োজনেই জীবনধারণের সকল সঞ্চয় লইয়া আপনি মাটি ফুঁড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া আসিল। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতার ভয় নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই; আশা নাই, নিরাশা নাই এক প্রকার কিছুই নাই। সজিনা ফুলটির মত আপনি ফুটিল, কেহ ফুটাইল না, কাঁটার বেড়া দিয়া বাঁচানর প্রশ্ন কাহারো মনেই জাগিল না। এমনিই হয়!

ডাল ঝোল ইত্যাদির অবিরাম সপাসপ শব্দের একঘেয়েমি ভঙ্গ করিয়া সতীশ কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "আপনি ত চলে যাচ্ছেন, কিন্তু আশ্রমের ছেলেরা সেদিন আপনাকে অত করে ধরলে, তাদের কি ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন?"

"একলা মেয়েমানুষ, অতগুলি লোকের কি করে ব্যবস্থা করব?"

"নাঃ আপনি আবার উপহাস করচেন!"

হরেন্দ্র স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, "উনি রহস্য করচেন মাত্র, ওটা ওঁর স্বভাব।"

সতীশ কহিল, "স্বভাব! তা হ'তে পারে, কিন্তু এই ধ্বংসোন্মুখ বিরাট জাতটাকে বাঁচাতে হলে ত একটা বন্দোবস্ত করতে হবে!"

কমল বলিল, "দেখুন, সতীশবাবু, ওইখানেই আপনাদের কথা আমি বুঝতে পারি না, আমার কথাও আপনারা বোঝেন না, অত্যন্ত একান্ত করে আপনারা প্রশ্নটাকে দেখেন। আমি বলব, নাই বা বাঁচল এ জাতটা, মরেই যদি, এর অতীত গৌরবের পুঞ্জীভূত ব্যাধি নিয়ে মরুক না, জগতের কিছু এসে যাবে না তাতে—"

বাধা দিয়া সতীশ কহিল, "তবে আপনি কি বলতে চান ভারতের ইতিহাস, উপনিষদ, অজন্তা, এলোরা, কালিদাস, তানসেন, গান্ধী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দের বাণী, এ সবই ধ্বংস হবে?"

"কামনা করি সতীশবাবু, তাই যেন হয়, ওরাই ভারতবাসীকে যমের দক্ষিণ দুয়ারে এনে হাজির করেচে, মুক্তির পথ দেখাতে পারেনি কখনো। ওসব ফাঁকা নামের মোহে আপনারা ভুলতে পারেন, আমি ত জানি যে শুধু-কথায় চিঁড়ে ভেজে না। মানুষ নরও নয়, নারীও নয়, সে হচ্ছে অর্দ্ধনারীশ্বর। তাই মেয়েমানুষকে ত্যাগ করে সাহিত্য,

সঙ্গীত, বিজ্ঞান, দর্শন সব বৃথা, কায়াকে ত্যাগ করে ছায়ার পিছনে দৌড়ান মাত্র!"

ইহার উত্তর কাহারো মুখে জোগাইল না। আশুবাবু অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "দেখ কমল, আমাদের যোগদর্শন বলেচে..."

হরেন্দ্র দৌড়িয়া গিয়া আশুবাবুর মুখে হাতচাপা দিয়া বলিল, "চুপ, চুপ, শাস্ত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত কমলের কাছে করবেন না, এখনই সর্ব্বনাশ হবে।"

অগত্যা আশুবাবু বলিলেন, "আমাদের 'ইয়ে'তে বলে, নিজের স্বরূপটি জানতে পারাই শক্তি। তুমি বোধ হয় তাই জানতে পেরেচ, তাই তোমার এই তীব্র তিতিক্ষা, তীক্ষ্ণ তর্কাতর্কি..."

কমল বাধা দিয়া বলিল, "ওটা যে আমার ধর্ম্ম, কাকাবাবু!"

সতীশ কহিল, "উনি না হয় চেপে গেলেন, কিন্তু আমিই জিজ্ঞাসা করছি আপনাকে, যোগদর্শন সম্বন্ধে আপনার ধারণাটি কিরূপ, সেটা না জানতে পারলে ত আর আশ্রমের ছেলেদের একটা কিনারা হতে পারচে না..."

"না, ওতে তাদের কোন কিনারাই হবে না, সতীশবাবু। ওর মধ্যে শালীনতার লেশমাত্র নেই। যদিও যোগদর্শন কি বস্তু আমি কিছুমাত্র বুঝি না, তথাপি অভিজ্ঞতা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝেচি যে যোগটা হচ্ছে এক-এর বাঁ-দিকে হর্দ্দম শূন্য লাগিয়ে যাওয়া। একশো বছর চক্ষু বুজে তপস্যা করলেও একমুখ দাড়ি আর নখচুলই গজাবে, কিন্তু একের পিঠে শূন্য আর বসবে না, চোখ চাইলেই যে ফাঁকাকে সেই ফাঁকা। কিন্তু রাত্রি অনেক হ'ল বোধ করি, কাকাবাবু। এইবার আমি উঠি।" বলিয়া সে ভুক্তাবশেষ কেরিয়ারের পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া সত্যই উঠিয়া যায় দেখিয়া অক্ষয় দ্রুত উঠিয়া আসিয়া

তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "দেখুন, এতদিনে বুঝেচি, আপনি যা বলেন, তাই ঠিক্। আমার পরিবারটি এতদিন পেটের অসুখে ভুগে ভুগে এমনটি হয়েছে, যেন একটি পেত্নী, দেখলেই গা-টা ছম্‌ছম্ করে। তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে নাকি প্রত্যাদেশ পেয়েচে আমার পা ধোয়া জল খেলেই তার ব্যায়রাম সারবে। সর্ব্বদা একটি ঘটি জল হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্চে, দেখতে পেলেই পা ধুয়ে জল খাবে, আমার পায়ে ত হাজা ধরিয়ে দিয়েচে," এই বলিয়া কমলকে পা তুলিয়া দেখাইল। সত্যই তাহার পা-টা হাজায় ভরিয়া গিয়াছে। কমল কিছুই বলিল না, বলিবার কিইবা ছিল? অক্ষয় কাতর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া অনুরোধ করিল, "বল, তুমি এর একটা ব্যবস্থা করবে? যদি মত কর ত কোথাও তোমাকে যেতে হবে না, এখানেই বেশ একটা বড় বাড়ী ভাড়া করে—" অজিত কখন আসিয়াছে কেহ লক্ষ্য করে নাই, অথচ সে কমলের পাশেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অক্ষয়কে বাধা দিয়া সে কহিল, "বাঃ, তা কি হয়! আজ রাত্রেই আমাদের যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে, আর অক্ষয়দা বলচ কিনা বাড়ীভাড়া করবে, না না,.. তা কেমন করে হবে!"

কমল অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িল। যেন তাহার জীবনের এই মুহূর্ত্তটিতে দু'টি সূর্য্যই যুগপৎ উঠিতে চায়। এরূপ হইবে, সে ত পূর্ব্বে ভাবে নাই। এখন কি করিবে সে? সে জানিত, শিবনাথ গুণী, শিল্পী, অজিত একজন বিচক্ষণ মোটর মেকানিক, অক্ষয় একজন সুপণ্ডিত ইতিহাসের অধ্যাপক। বস্তুতঃ চিরস্থায়ী প্রেম ওদের পথের বাধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন; মেয়েরা শুধু উপলক্ষ্য, নচেৎ ওরা ভালবাসে কেবল নিজেকে।

সূর্য্যাস্তবেলার মেঘের গায়ে যে রং ফোটে, তার বর্ণও আপন নয়, সে স্থায়ীও নয়, দেখিতে দেখিতে তার কতরূপই না পরিবর্ত্তন হয়, কখনও ঘোড়া, কখনও উট, কখনও অষ্ট্রিচ, কখনও হিপো-পটেমাস, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে মিথ্যা বলিবে কে? কে বলিবে, অহারা এক একটি নিষ্ঠুর সত্যের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিতেছে না? কি করিয়া তাহার জীবনে এই চমকপ্রদ এবং মর্ম্মান্তিক সমস্যার সমাধান হইবে?

সে ভাবিয়া একটি উপায় স্থির করিল। বলিল, "দেখুন এই আধুলিটা আমি আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেব, যদি রাজার মুখ চিৎ হয়ে পড়ে তবে অক্ষয়বাবু যা বলবেন তাই ঠিক, আর যদি উল্টো দিক চিৎ হয় তবে অজিতবাবুর প্রোগ্রামই ঠিক।" বস্তুতঃ ইহা ছাড়া আর উপায় ছিল কি? কিন্তু আধুলিটা পড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিতে লাগিল, কোনদিকেই আর টলে না। অক্ষয় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আধুলিটা ধরিয়া চিৎ করিয়া দিলেন। আশুবাবু কহিলেন, "ও হ'ল না, আমায় দাও আবার করচি।" এমন সময় এক টেলিগ্রাম পিওন দ্বার-প্রান্তে উপনীত হইতে, তাঁহার হাতের মুদ্রা হাতেই রহিল। হরেন্দ্র তারটি খুলিয়া পড়িলেন:—তিন চার দিন হইল রাজেন্দ্র মারা গিয়াছে। সে কয়দিন যাবৎ মথুরার পথে পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান তাহার ছিল না। হঠাৎ স্থানীয় হনুমান জীউর মন্দিরে আগুন লাগিয়া যাওয়ায় রাজেন্দ্র আগুনে ঝাঁপ দিয়া জ্বলন্ত হনুমানজীর মূর্ত্তিটিকে উদ্ধার করে, কিন্তু তাহাতেও মূর্ত্তিস্থ অগ্নি প্রশমিত না হওয়ায় সে তৎসহিত নিকটস্থ কূপে ঝম্প প্রদান করে। তাহার পর ডুবুরিদের সাহায্যে উভয়কে কূপ হইতে উত্তোলন করিলে দেখা যায়

...রাজেন্দ্র এবং হনুমানজী পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ......

পৃষ্ঠা ১০৩

রাজেন্দ্র এবং হনুমানজী পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ এবং উভয়েই অৰ্দ্ধ দগ্ধীভূত। বস্তুতঃ কোনটি রাজেন্দ্র আর কোনটি হনুমানজী তাহা বুঝিতে না পারিয়া উভয়কেই মহাসমারোহে একত্রে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। একটি বেশ বড় মঠ উক্ত সমাধির উপর প্রতিষ্ঠা করা হইবে, সে জন্য মথুরায় চাঁদা উঠিতেছে, মঠ-কমিটীর সেক্রেটারী সংবাদটি জ্ঞাপন পূর্ব্বক রাজেন্দ্রের বন্ধুবর্গের নিকট চাঁদা চাহিয়াছেন। প্রিপেড তার, চাঁদার টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইলেই ভাল হয়। আশুবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে হস্তস্থিত আধুলিটি এবং আর একটি পাঁচ টাকার নোট এই মোট সাড়ে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া দিলেন। অজিতও পকেট হইতে কিছু বাহির করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু কমল তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "না, তুমি এক পয়সা দিয়ো না। অজ্ঞানের বলি চিরদিন এম্‌নি করেই আদায় হয়, বলেছিলাম না, সমাধিস্তম্ভের নাম দিয়ে কেবল ভূতেরই পূজা করা হবে। অমন নিশ্ছিদ্র করে বাড়ী গাঁথতে যেয়ো না, ওতে মড়ার কবর তৈরী হয়, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হয় না, রামদীন চলো।" এই বলিয়া সে অজিতের হাত ধরিল। অজিত সত্যই চলিয়া যায় দেখিয়া অক্ষয় মিনতির সুরে বলিল, "দেখ অজিত, সেদিন তাজমহলের সমুখে যে পিঠে ঘুসি মেরেছিলে, শিরদাঁড়াটার ব্যথা কিছুতেই যাচ্ছে না, একজন গুণীন্ বলেছে—যে মেরেছে তার বাঁহাতটা পিঠে বুলিয়ে একটি মন্ত্র আবৃত্তি করলেই এটা সেরে যাবে। আমি মন্ত্রটা মনে মনে বলচি, তুমি ভাই আমার শিরদাঁড়ায় তোমার বাঁহাতটা বুলিয়ে দাও।"

বারান্দা হইতে নীচেই দেখা গেল কমলকে লইয়া আশুবাবু গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মোটরের আলো দূর হইতে দূরান্তরে

মিলাইয়া গেলেও অজিত অক্ষয়ের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কি যেন বহুমূল্য জিনিষ হারাইয়াছে এরূপ ভাবে ব্যস্ত হইয়া এ পকেট ও পকেট খুঁজিতে লাগিল।

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কি, কি হারাল?"

অবশেষে অজিত জামার ভিতর-পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ টানিয়া বাহির করিল, লণ্ঠনের আলোকে তাহা পড়িবামাত্র আনন্দে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, অক্ষয়দা, আমার মালপত্রের লিষ্ট, ভয় নেই, একটা ডুপ্লিকেট কমল রেখে গেছে, বাসায় যেয়ে সব মিলিয়ে নিতে হবে, মালটাল সব ঠিক আছে কিনা, একটা বিছানার মোটের মধ্যে একগাদা টাকা আছে যে!"

বাহিরের অন্ধকারে মুখ বাড়াইয়া অক্ষয় বলিল, "তা ত হ'ল, ওরা গেল কোথায়, কামস্কাট্‌কায় না কি?"

প্রত্যুত্তরে অজিত অক্ষয়ের পৃষ্ঠে বাঁ হাত বুলাইতে লাগিল, কোন কথা কহিল না।